মিশারি আল-খিরাজ

লাভ অফ আল্লাহ

(নামাজের সৌন্দর্য অনুভব করুন)

মাওলানা আব্দুর রহমান হানিফ

অনূদিত

জীবনের স্বার্থকতা তাঁর স্মরণে
জীবনের আসল স্বাদ তাঁর দর্শনে

Love of Allah

লাভ অফ আল্লাহ

[নামাজের সৌন্দর্য অনুভব করুন!]

মূল
মিশারি আল-খিরাজ

সংস্কার
আলিফ, বা আল-মুহরি

অনুবাদ
মাওলানা আব্দুর রহমান মুহাম্মদ হানিফ
শায়খুল হাদিস, জামিয়া এমদাদিয়া আরাবিয়া শেখেরচর, নরসিংদী

দারুল আরকাম

প্রথম প্রকাশ : মে-২০২১
© প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
দারুল আরকাম এর পক্ষে প্রকাশক মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ কর্তৃক
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং ১০) গ্রাউন্ড ফ্লোর, বাংলাবাজার
ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও পরিবেশিত।
ফোন : ০১৯৭৭ ৬৪ ৮১ ৮৫

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
মূল্য : ১২০.০০

Love of Allah
By **Mishari al-khiraj**
Translated by **Mawlana Abdur Rahman Muhammad Hanif,**
Published **DARUL ARQAM**
Islami Tower, Banglabazar, Dhaka.
Price : BDT 120.00

অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফি লাইফ, রকমারি, রাইয়্যান শপ

সূচীপত্র

ভূমিকা---------- ৮
পূর্বসূরীদের ঘটনাবলীতে একটু চোখ ফেরান!---------- ৯
ইহতিসাব তথা হিসাব-নিকাশই চাবিকাঠি ---------- ১০
আল্লাহু আকবার বলার রহস্য ---------- ১৩
বাদশার অভ্যর্থনা এবং ঝামেলাকারীকে বের করে দেয়া---------- ১৪
কু-মন্ত্রণাদানকারী (শয়তান)-কে দূরে ভাগানো---------- ১৫
নামাজের হাকিকত বা রূহ ---------- ১৬
আমাদের সামর্থের ঊর্ধ্বের এক সফর---------- ১৮
সুরা ফাতিহার রহস্যাবলী নিয়ে একটু ভাবুন ---------- ২০
একটু সামান্য আঘাত---------- ২৩
মুক্তির চাবি কাঠি---------- ২৫
অন্তর থেকে তেলাওয়াত করুন ---------- ৩২
নিজের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন পূরণ করবো---------- ৩৪
নামাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের প্রস্তুতি ---------- ৩৭
প্রকৃত আনন্দ কীভাবে অর্জিত হবে ---------- ৩৯
একটি পূর্ণাঙ্গ সেজদা ---------- ৪২
একটি বিনীত নিবেদন---------- ৪৫
বিদায়ী দৃশ্য ---------- ৪৭
সাক্ষাতের অবগতি, নামাজের দিকে ডাকো---------- ৫০
লক্ষণীয় বিষয় ---------- ৫৪
সারকথা ---------- ৫৭
আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের দুআসমূহ ---------- ৬৩

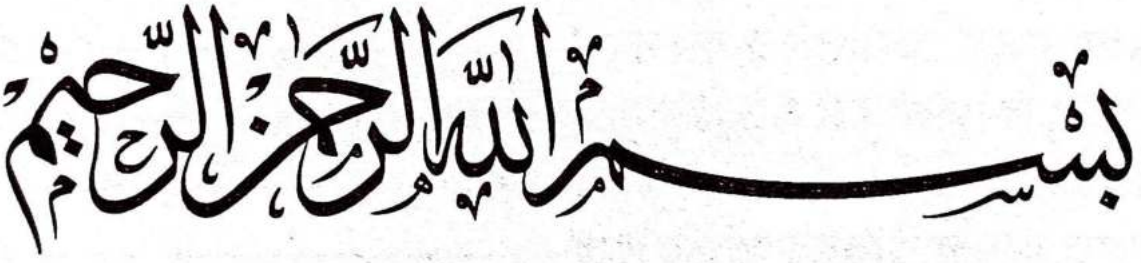

بسم الله الرحمن الرحيم

শুরু করছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদকে কিছু কথা

নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লী আলা রাসুলিহিল কারিম, আম্মা বাদ, মানবজাতীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা ও আল্লাহ পাকের ইশক ও মুহাব্বতের দ্বারা নিজের অন্তরকে নুরানী ও আলোকিত করা তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

والذين امنوا اشد حبا لله.

ইমানদারগণ আল্লাহ তাআলাকে অনেক বেশি মুহাব্বত করেন।

আর এ মুহাব্বতের আধিক্য হয় আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যেমে আর ইবাদতের মধ্য হতে সবচেয়ে বেশি মুহাব্বত বৃদ্ধির মাধ্যম হলো নামাজ। তাই আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বেশি মাহবুব বান্দা রাসূলে কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

قرة عيني في الصلوة.

নামাজে রয়েছে আমার চোখের শীতলতা।

আর কি ধরনের নামাজ আল্লাহ পাকের মুহাব্বত সৃষ্টি করে? মনোযোগ ও খুশু-খুযু বিহিন নামাজ? না, বরং যে নামাজ অত্যান্ত মনোযোগ এবং খুশু-খুযুর সাথে আদায় করা হয়। আর এ মনোযোগ কীভাবে অর্জন হবে বক্ষমান পুস্তিকায় গ্রন্থকার সেই কার্যকর পদ্ধতিই বাতলিয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোনো মুসলমান যদি উক্ত পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করেন অবশ্যই তার মধ্যে মনোযোগ ও খুশু-খুযু সৃষ্টি হবে। তার নামাজই হবে প্রকৃত নামাজ। সেই হবে والذينهم في صلاتهم خٰشعون. 'সফল মুমিন তারা যারা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে নামাজ আদায় করে' এর উদ্দেশ্য তার নামাজই হবে আল্লাহ পাকের গভীরর মুহাব্বত সৃষ্টির মাধ্যম। সেই হবে দুনিয়া-আখেরাতের সফলকাম এবং আল্লাহ পাকের মাহবুব বান্দা। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এভাবে নামাজ আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ভূমিকা

এ পুস্তিকাখানি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ, রমজান মাসের ইমেইল স্টেট এর অংশ। যাতে মিশারি আল-খিরাজি এর প্রসিদ্ধ দরস 'সালাতের আসল স্বাদ কীভাবে অর্জন করবে' এর সার-সংক্ষেপ।

গ্রন্থকার আমাদেরকে সত্য রবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে এ রহস্যাবলী উপস্থাপন করেছেন যে, এ জীবনের মাধুর্যতা ও স্বাদ তাঁর স্মরণে রয়েছে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মাধুর্যতা ও স্বাদ তাঁর দিদার বা দর্শনে রয়েছে। তাই সামনে যখন তুমি নামাজ পড়তে যাবে, তখন এ জন্য যাবে যে, তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) মহব্বত করো। এ জন্য যাবে যে, তুমি তাঁকে স্মরণ করছো এবং তাঁর সাক্ষাত কামনা করছো। অন্তরে তার জন্য অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া চাই। তবেই তুমি নামাজের আবশ্যকীয় বস্তু ও অন্তরের প্রশান্তি লাভে সক্ষম হবে।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যেন আমাদেরকে নামাজের সকল বরকত লাভ করার তাওফিক দান করেন এবং আমাদেরকে তাঁর অধিক প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য করেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার মহব্বতের ধারক বানান। আমাদেরকে তাদের মহব্বত দান করুন যাদেরকে আপনি মহব্বত করেন এবং ওই আমলের মহব্বত যা আমাদেরকে আপনার মহব্বতের নিকটবর্তী করে দেয়। আমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করুন। আমাদের পাপ মোচন করুন। আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে জান্নাতে আপনার সর্বাধিক নিকটবর্তী করে দিন। আমিন!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আপনি কি কখনো এ উপলব্ধি করেননি যে, নামাজের যে প্রতিক্রিয়া আপনার জীবনে হওয়া উচিত ছিল তা অর্জন করতে পারছেন না? আপনার বিবেকে কি এ কথা মেনে নিচ্ছে না যে, সম্ভবত এটা এজন্য হচ্ছে যে, নামাজের যে গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল তা আমি দিচ্ছি না? মনে হচ্ছে বিষয়টি আমাদের জানা নেই বা আমাদেরকে উক্ত বিষয় থেকে অজ্ঞ রাখা হয়েছে, যার দ্বারা আমরা নামাজের বরকতসমূহ লাভ করতে পারি।

পূর্বসূরীদের ঘটনাবলীতে একটু চোখ ফেরান!

১. একদা একজন মুসলমান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্য বের হলো। (উক্ত যুদ্ধ হতে ফেরার পথে রাত্রিবেলায় সৈন্যদল এক জায়গায় আরাম করবেন)। তাই পাহারাদারীর জন্য একজন আনসারি ও এক মুহাজির সাহাবিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিযুক্ত করলেন। উভয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন, রাত্রির কিছু সময় একজন আরাম করবেন অপরজন পাহারাদারী করবেন। পরে দ্বিতীয়জন আরাম করবেন এবং অপরজন পাহারাদারী করবেন। তাই পরামর্শ মোতাবেক প্রথমে মুহাজির সাহাবি আরাম করার জন্য শুয়ে পড়লেন আর আনসারি সাহাবি যিনি পাহারা দিচ্ছেন, তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সুযোগ বুঝে এক কাফের আনসারি সাহাবির সিনায় তীর নিক্ষেপ করল। তিনি তীর খুলে ফেলে দিলেন এবং নামাজ চালিয়ে গেলেন। কাফের দ্বিতীয়বার তীর ছুড়ল এবং এবারও তিনি তীর খুলে ফেললেন এবং নামাজ চালু রাখলেন। সেই কাফের তৃতীয়বারও তীর ছুড়ল, কিন্তু এবার তিনি তা সহ্য করতে পারলেন না। তাই তিনি রুকু-সেজদার মাঝেই জমিনে পড়ে গেলেন। তাঁর শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ রক্ত ঝরছিল। যখন ওই মুহাজির তার সাহায্যের জন্য পৌঁছল, ততক্ষণে কাফির পালিয়ে গেল। মুহাজির সাহাবি বলল, সুবহানাল্লাহ! তুমি আমাকে প্রথমবার তীর লাগার সাথে সাথে কেন জাগালে না? আনসারি উত্তরে বললেন, আমি নামাজে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী সুরা তেলাওয়াত করছিলাম তাই তা মধ্যখানে ছাড়তে চাইনি।

২. একদা ইমাম বুখারিকে এক বিষাক্ত পোকায় নামাজে ১৭ বার দংশন করেছে (কিন্তু নামাজ ছাড়েননি)। যখন তিনি নামাজ থেকে ফারেগ হন, তখন ভীষণ কষ্ট অনুভব করেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কেউ জানো কি, কিসে আমাকে কষ্ট দিল?

৩. কামান থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-এর উপর পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল এবং তাঁর খুব কাছেই নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, অথচ তখনও তিনি গভীর মনযোগের সাথে নামাজে মশগুল ছিলেন।

৪. বর্ণিত আছে হযরত আলি রাযি. যখন নামাজের জন্য ওজু করতেন, তখন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে এ ভয়ে তাঁর শরীর নীলবর্ণের হয়ে যেত এবং তিনি কাঁপতে থাকতেন।

৫. এক সাহাবির অপারেশনের প্রয়োজন হলো, তখন তিনি অনুরোধ করেন এটা ওই সময় করবে, যখন আমি নামাজরত থাকি।

৬. একবার মসজিদের পূর্ণ দেয়াল ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে একজন সাহাবি নামাজ পড়ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, উক্ত সাহাবি তা অনুভব করতে পারেননি। এমনকি তিনি নামাজ শেষ করলেন।

উল্লেখিত বুজুর্গগণ নামাজে কী পরিমাণ প্রশান্তি ও মজা লাভ করেছিলেন? এটা কি সম্ভব যে, আমরাও সে ধরনের মজা লাভ করতে পারবো?

আমরা আপন নামাজে সেই ফল কিভাবে লাভ করবো? (বক্ষমান পুস্তিকায়) তাই শিখাতে চাচ্ছি।

ইহতিসাব তথা হিসাব-নিকাশই চাবিকাঠি

নিজের মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়া আমাদের নামাজের হিসাব করা আবশ্যক। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে আমরা ইবাদত কেন করছি? শুধু এ জন্য যে, আমাদের এরূপ করা উচিত? না এজন্য যে, এটা আমার দৈনন্দিন অভ্যাস? না এজন্য যে, অন্য লোকও এরূপ করে তাই আমিও করি।

পরিবর্তনের সময় এসেছে। খাঁটি মহব্বতের সাথে ইবাদত করতে হবে। এভাবে ইবাদত করুন যে, আপনি যাকে মহব্বত করেন, সেই মাহবুবের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ হচ্ছে। এমন প্রশান্তি ও আরাম লাভের নিমিত্তে ইবাদত করুন, যাতে আপনার ওই মুহূর্তটি হাসিল হয় যে, আপনি ওই

সত্তার সান্নিধ্যে আছেন, যার প্রতি আপনার অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। তাই আমাদেরকে পরিপূর্ণ ইখলাস, মহব্বত, মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে ইবাদত করতে হবে।

এমন ৩টি বিষয় রয়েছে, যার কারণে একে অপরকে মহব্বত করে।

১. এজন্য যে, সে সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্যের অধিকারী।

২. অথবা এজন্য যে, সে তোমার সাথে সর্বদা স্নেহ ও দয়ার সম্পর্ক রাখে।

৩. অথবা এজন্য যে, কেউ তোমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছে।

এখন আল্লাহ পাকের ব্যাপারে চিন্তা করুন। তিনি সবকিছুর চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ কি-না? তিনি আমাদের সবচেয়ে বেশি মহব্বতের দাবিদার কি না?

আল্লাহর ওপর সত্যিকার মহব্বতই আসল মহব্বত এবং এই মহব্বত দ্বারাই সত্যিকার ইমানের মজা লাভ হবে। নিজের চতুর্দিকে বিদ্যমান সৌন্দর্যমণ্ডিত সৃষ্টিকে দেখুন, চাই তা প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে হোক। এসব কিছুই আল্লাহ তাআলার সৌন্দর্যের এক ঝলক মাত্র। যদি প্রত্যেক মানুষকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর মতো সুন্দর বানানো হতো এবং সৌন্দর্যকে দৃশ্যমান সকল সৌন্দর্যের সাথে মিলানো হতো যা আমাদের চতুর্দিকে বিদ্যমান, তবুও এসকল সৌন্দর্য আল্লাহ পাকের সৌন্দর্যের সামনে এমন মনে হতো, যেমন সূর্যের আলোর বিপরীতে মিটিমিটি করে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির আলো। আল্লাহ তাআলার সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই, যা তাঁর মর্যাদাকে দ্বিগুণ করে দেয়। একটু ভাবুন! যখন তোমরা নামাজে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হও, তখন তিনি তাঁর সবচেয়ে সুন্দর মর্যাদাপূর্ণ (কুদরতি) চেহারা তোমাদের জন্য সামনে রাখেন।

আল্লাহ পাকের সৌন্দর্যতা আমরা এ ধ্বংসশীল চোখে দেখতে পারব না, যদি তিনি তাঁর সৌন্দর্য আমাদের ওপর প্রকাশ করেন, তবে যা কিছু বিদ্যমান আছে সব জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।

মুসা আলাইহিস সালাম এর ঘটনা নতুন করে স্মরণ করুন। যখন তিনি আল্লাহ তাআলাকে দেখার আবেদন করলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন,

لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا.

তুমি আমাকে দেখতে পাবে না তবে এ পাহাড়ের দিকে দেখ যদি সেটা নিজের স্থানে স্থির থাকতে পারে তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা পাহাড়ের উপর আপন তাজাল্লি দান করলেন, যার ফলে পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মুসা আলাইহিস সালাম বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।[১]

এটা তো মুসা আলাইহিস সালাম-এর অবস্থা, যা আল্লাহ পাকের তাজাল্লি প্রাপ্ত পাহাড় দেখে হয়েছিল। এখন চিন্তা করুন, যদি তিনি সরাসরি আল্লাহ তাআলাকে দেখতেন তবে তাঁর অবস্থা কী হতো!

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দয়া ও করুণার বিষয় যতদূর রয়েছে আপনি আপন চক্ষুদ্বয় কিছুক্ষণ বন্ধ করে দেখুন যে, এটা আল্লাহ তাআলার কত বড় নেয়ামত। আমরা যদি তাঁর নেয়ামতসমূহ গণনা করতে শুরু করি তবে তা গণনা করে শেষ করতে পারব না। আমরা যখন কোনো নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তখন কতটা অসন্তুষ্ট হয়েছি। আমরা ওই সময় স্বভাবজাত তাড়াহুড়াবশত এতে আল্লাহ পাকের গোপন রহস্য বুঝতে পারিনি যে, হতে পারে এতেই রয়েছে আমাদের জন্য কল্যাণ। পরে আমাদের বুঝে এসেছে যে, এতে কী পরিমাণ কল্যাণ নিহিত ছিল। যেহেতু আল্লাহ পাক হচ্ছেন পরিপূর্ণ কল্যাণময় ও দয়াশীল।

একটু চিন্তা করুন, যখন আমরা উক্ত মালিক এর বিরুদ্ধাচরণ করে পাপ করি, আমরা তাঁর দেয়া নেয়ামত ভোগ করে গুনাহের কাজ করি, তারপরও তিনি আমাদেরকে নেয়ামত দান করেন এবং হেফাজত করেন। বাস্তবিকপক্ষে আপনার জন্য তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালু আর কেউ নেই। তাঁর চেয়ে অধিক দানশীল আপনার জন্য আর কেউ নেই। সুতরাং আপনার জন্য তাঁর চেয়ে অধিক মহব্বতের হকদার আর কেউ হতে পারে না। তাঁকে স্মরণ করুন, এ জীবনের স্বাদ তাঁকে স্মরণ করার মাঝেই রয়েছে। পরবর্তী জীবনের মজা তাঁর দিদারে রয়েছে। পরবর্তীতে যখন নামাজে যাবেন এজন্য যাবেন যে, আপনি তাঁকে মহব্বত করেন। এজন্য যাবেন যে, তাঁর স্মরণ আপনার হয়েছে এবং আপনি তাঁর সাথে সময় কাটাতে চাচ্ছেন। এসব ভেবে আপনার অন্তরে যখন আনন্দের ঢেউ খেলবে, তবেই আপনি নামাজের স্বাদ ও প্রশান্তি লাভ করবেন। যা নামাজের আসল উদ্দেশ্য।

---

১. সুরাতুল আরাফ-১৪৩।

আল্লাহু আকবার বলার রহস্য

যখন আল্লাহু আকবার বলেন তখন কী হয়? তবে এটা জানার পূর্বে আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি যে, নামাজের শুরু কেন আল্লাহু আকবার দ্বারা করা হয়? কেন সুবহানাল্লাহ বলি না?

'আল্লাহু আকবার' এমন একটি বাক্য, যা দ্বারা আমরা এ কথার স্বীকৃতি দিই যে, ওই সত্তা যাঁর সামনে আমরা দণ্ডায়মান আছি, তিনি আমার নিকট দুনিয়া এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদের চাকরি, কাজ-কারবার, আমাদের নিদ্রা, আমাদের সম্পদ, আমাদের বংশ, আমাদের সন্তান, আমাদের সকল সমস্যা ও সকল প্রয়োজনের চেয়ে বড়।

আমরা কেন হাত উত্তোলন করি? এজন্য যে, আমরা সবকিছু পেছনে ফেলেছি। আমরা এ জন্য আমাদের হাত উঠাই যে, আল্লাহ পাকের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ সোপর্দ করা প্রকাশ পায়।

বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তাআলা হুকুম দেন, আমার ও বান্দার মাঝে সকল পর্দা সরিয়ে দাও। তাই বান্দা যখন 'আল্লাহু আকবার' বলে তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বরকতপূর্ণ ও মহান দয়ার চেহারা তাঁর সম্মুখে করে দেন এবং তিনি আপনার থেকে ওই পর্যন্ত চেহারাকে ফিরান না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজে না ফেরান। আর এ ফিরিয়ে নেয়া ওই সময় হয়, যখন আপনি আপনার দৃষ্টি এবং অন্তর দুনিয়াবি বিষয়াদির দিকে আকৃষ্ট করেন। আর আপনি যখন পাল্টে যান, তখন আপনাকে আওয়াজ দেয়া হয়, তুমি কেন পাল্টে গেছ, এমন কী আছে যা আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ? তখন হুকুম করেন যে, পুনরায় পর্দা ঢেলে দাও।

আপনি যখন 'আল্লাহু আকবার' এর ঘোষণা করেন, তখন এ কল্পনা করুন যে, আপনি ক্যামেরার সম্মুখে আছেন এবং 'On the air' এর লাল বুতাম টিপ দেয়া হয়েছে। আপনি এমন সত্তার সামনে দণ্ডায়মান আছেন, যিনি সকল সৃষ্টিকুলের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। যিনি সবকিছুর উপর এখতিয়ার রাখেন, সবকিছু তাঁর ক্ষমতার অধীনে। এখন আপনার অবস্থা কেমন হবে? আপনার মনের অস্থিরতা একটু অনুভব করুন!

'আল্লাহু আকবার' বলে যখনই আমরা সামনে অগ্রসর হই, আমাদের অঙ্গসমূহের দ্বারা সংগঠিত পাপসমূহ উপরে উঠতে থাকে এমনকি তা

আমাদের মাথা এবং কাঁধ বরাবর পৌঁছে যায়। অতঃপর প্রত্যেক রুকু ও সিজদাতে উক্ত পাপসমূহকে আমরা নিজেরাই দূরে নিক্ষেপ করতে থাকি। (রবের সামনে দীর্ঘ সময় অবস্থান করার বাহানা হিসেবে আমরা এ বিষয়গুলো নির্ধারণ করি।)

'আল্লাহু আকবার' বলার সাথে পূর্বের সামান্য জায়েজ বস্তুও এখন আমাদের জন্য নিষেধ হয়ে যায়। যেমন– খানা-পিনা, কথা-বার্তা বা অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া ইত্যাদি। এমন কী হয়ে গেল? পূর্বের অবস্থা আর এখনকার মধ্যে কী ভিন্নতা? এমনিতেই তো এ সকল কাজ এ ধরনের পবিত্র সাক্ষাতে উপযুক্ত না। আপনি আপনার মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে হাত বেঁধে দাঁড়িয়েছেন। এখন আপনি এক বিরাট মর্যাদায় উপবিষ্ট। একটু লক্ষ করুন, এখনো কি আপনি অমনোযোগী থাকবেন? এজন্যই আমরা 'আল্লাহু আকবার' এ মহান শব্দ বারবার বলি। প্রত্যেক উঠা বসাতে বলি। এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এটা মনোযোগ দেয়ার জায়গা।

বাদশার অভ্যর্থনা এবং ঝামেলাকারীকে বের করে দেয়া

'আল্লাহু আকবার' বলে আপনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে নামাজে প্রবেশ করেছেন। আপনি আপনার দৃষ্টি সেজদার স্থানে নিবদ্ধ করছেন এবং নিজের হস্তদ্বয় অন্তরের কাছাকাছি বাঁধছেন এটা কেন? ভাবুন যে, আপনি শাহী মহলে চলছেন এবং আপনি এমন লোকদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছেন, যারা আপনার থেকে কিছু দূরে দাঁড়ানো। তাদের কিছু লোকের দৃষ্টি আপনার প্রতি স্থির করে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন, আর কিছু লোক দৃষ্টি অবনত করে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন।

উক্ত অবস্থা দ্বারাই বোঝা যায় কে বাদশা এবং কে নওকর। বিষয়টি এমন নয় কি? সুতরাং আমাদের জন্য এটা উচিত নয় কি যে, আমরা যখন প্রকৃত মালিকের সামনে দাঁড়াই, তখন অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে দাঁড়াই। আমরা যখন জানতে পারবো আমরা কার সামনে দাঁড়াচ্ছি, তখন বিনয় এমনিতেই সৃষ্টি হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার সম্মুখে আমাদের বিনয় মূলত আমাদের ইজ্জত। যেহেতু আমাদের এ অক্ষমতা অন্য লোকের সামনে অক্ষম হওয়া থেকে মুক্তি দেয়। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

সে এক সেজদা যা তুমি মনে করো ভারি–

হাজার সেজদা থেকে তোমাকে দেবে মুক্তি।

এখন নিয়মানুসারে আপন বাদশাকে সালাম পেশ করবে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

হে আল্লাহ! তোমার সত্তা পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তোমারই জন্য, তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ, তুমি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিখানো কতেক 'হামদ' হতে যেকোনো 'হামদ' দ্বারা সালাম পেশ করা যায়। বর্ণিত প্রতিটি 'হামদ' আমাদের মধ্যে নতুন চেতনা জাগ্রত করে। আমাদের প্রত্যেক নামাজে বিভিন্ন হামদ উক্ত বরকতপূর্ণ মুহূর্তে মনোযোগ স্থায়ী করার সহযোগী হয়।

কু-মন্ত্রণাদানকারী (শয়তান)-কে দূরে ভাগানো

আপনি যখন রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে দাঁড়ান, তখন এ বরকতপূর্ণ মুহূর্তে এবং এ বরকতপূর্ণ আমলে সবচেয়ে বড় শত্রু হলো শয়তান। সুতরাং সে যথাসাধ্য চেষ্টায় লেগে যায়, যেন আপনার সর্বাধিক প্রিয় মাহবুবের সাক্ষাতের মুহূর্তে আপনার বিনিময় এবং সওয়াব ছিনিয়ে নিতে পারে। ফলে আপনার পূর্ণ নামাজের $\frac{১}{৩}$ বা $\frac{১}{৫}$ বা $\frac{১}{৯}$ বা $\frac{১}{১০}$ অংশই গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা এটা একটা কঠিন বাস্তবতা যে, আপনার নামাজের ওই পরিমাণই গ্রহণযোগ্য হয়, যা পূর্ণ মনোযোগ ও ইখলাসের সাথে আদায় করা হয়। (কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি নিজের সাথে ৯০ বছরের নামাজ নিয়ে আসবে; কিন্তু সে এতে বিস্মিত হবে যে, তার আমল নামায় ৪, ৫ বা ৬ বছরের নামাজ লেখা হবে।)

এরূপ এজন্য হবে যে, শয়তান আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। আপনি কি চিন্তা করেননি, কত ধরনের নিত্যনতুন কল্পনা, অনুভূতি কীভাবে নামাজের মাঝে এসে পড়ে? যে বস্তু আপনি দীর্ঘকাল ধরে ভুলে গেছেন, হঠাৎ আপনার

সামনে এসে উপস্থিত। এমনকি জায়নামাজের মনোরম দৃশ্য আপনার সামনে এক নতুন ঘটনার অবতারণা করে। আপনি কী করেন? তাকে মন থেকে তাড়িয়ে পুনরায় মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা পুনরায় ফিরে আসে। আপনি পুনরায় চেষ্টা করেন, কিন্তু পুনরায় উক্ত কল্পনা মাছির ন্যায় ফিরে আসে। যা আপনাকে ছাড়তে চায় না।

এর সমাধান কী? আমরা তো খুবই দুর্বল। আমরা আপন মাহবুবের আশ্রয় কামনা করি বিতাড়িত শয়তান থেকে, যে আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি। তাঁর বরকতময় নাম নিয়ে, যে নামে সকল পেরেশানি থেকে মুক্তি মিলে। তাই আমরা নামাজের শুরুতেই অত্যন্ত বিশ্বাসের সাথে বলি-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

এটা বলার সাথে নিজের মধ্যে তার শক্তিও উপলব্ধি করি।

নামাজের হাকিকত বা রূহ

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস ছিল, যখন নামাজের সময় হতো তখন বলতেন, হে বেলাল! আমাকে শান্তি দাও। অন্য শব্দে (এভাবেও বলতেন) বেলাল! তুমি আজান দাও, তাহলে আমার বোঝা হালকা হবে এবং আমি শান্তি পাবো। কেননা যখনই বিপদ-আপদ আসতো তখনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর আল্লাহ তাআলাও বলেছেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.

'আর বিপদাপদে সবর ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর তা অত্যন্ত কঠিন তবে যারা 'নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করে (তাদের জন্য নয়)।[২]

প্রত্যেক লোকের আরাম ও প্রশান্তি লাভের একটা মাধ্যম থাকে। কিছু লোক সংগীতের মাধ্যমে, কিছু লোক ইয়োগার মাধ্যমে, আবার কিছু লোক

---

২. সুরা বাকারা : ৪৫।

দুর্ভাগ্যবশত নেশার মাধ্যমে শান্তি লাভ করতে চায়। আর মুমিনের অন্তর নামাজের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করে। আমরা সবধরনের প্রশান্তি লাভ করবো আপন মাহবুব রাব্বুল আলামিন থেকে।

এখন আমরা নিজেকে শয়তান থেকে মুক্ত করে নামাজে দাঁড়াব, যা সকল প্রশান্তির উৎস। সুরাতুল ফাতিহা' পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি সুরা, যা ছাড়া নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। এটা নামাজের এমন একটা অংশ, যার প্রত্যেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা জবাব দেন। তাহলে আমরা কীভাবে নামাজের এ অংশ উদাসীনতার সাথে আদায় করবো?

নামাজ শুরু করার পূর্বেই এ বিষয় অন্তরে বদ্ধমূল করে নেবো যে, কোন জিনিস আমাকে এখানে দাঁড় করিয়েছে? আর তা হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও সাক্ষাতের আশা। আর যে ব্যক্তি আসল মাহবুবের সাথে সাক্ষাত করে, সর্বপ্রথম তার মুখ থেকে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তা হলো তার মাহবুবের সুমিষ্ট নাম। তবে এটাতো সাধারণ নাম নয়। এটা এমন একটি বরকতপূর্ণ নাম, যা তার চারপাশের সবকিছুকে বরকতময় করে দেয়। এই নাম যার উপরই পড়া হয়, তা হতে সবধরনের অনিষ্টতা, দুঃখ কষ্ট দূর করে দেয়। এ নামেই আমাদের শুরু এবং এ নামেই আমাদের সমাপ্তি। এ নাম দ্বারাই আমরা ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তি লাভ করি।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

পরম করুণাময় ও সীমাহীন দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

যখনই আপনার জবানে উক্ত শব্দগুলো উচ্চারিত হয় অন্তরে আনন্দের ঢেউ খেলতে থাকে।

هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

সকল মাখলুকের তিনিই সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।[৩]

---

৩. সুরাতুল হাশর : ২৪।

আপনি যখন কাউকে মহব্বত করেন তাতে কত মজা পান? অথচ আল্লাহ ছাড়া এর উপযুক্ত কেউ নন। আল্লাহ তাআলার সত্তা সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি উভয় জাহানের রব।

উক্ত হামদ বর্ণনা করে আমরা তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিপূর্ণ সত্তার স্বীকৃতি দেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। ওজনের পাল্লাকে ভরে দেয়। তাই উক্ত কালিমা বলার সাথে সাথে আমাদের অন্তর কৃতজ্ঞতা দ্বারা ভরে যাওয়া উচিত। তিনি আমাদেরকে কত ধরনের নেয়ামত দান করেছেন। সর্বদা এ বিষয় মনে রাখবে, আমরা দুনিয়াতে যখনই কোনো কৃতজ্ঞতা আদায় করি, প্রকৃতপক্ষে সেটা মহান আল্লাহ তাআলারই কৃতজ্ঞতা হয়। তিনিই তো সকল কল্যাণের উৎস। আসুন বিষয়টি আরও গভীরভাবে দেখি যে, আমরা যখন বলি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। তখন এ বিষয়ের উপরও কৃতজ্ঞতা আদায় করি যে, তিনি আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের যোগ্যতা দান করেছেন। এ যোগ্যতাও তাঁর দান। মূলত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের মাধ্যমে আপন বড়ত্ব ও মহত্ব প্রতিষ্ঠা করছেন। আমার রব কতই না মর্যাদাবান। নিজের সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর প্রয়োজনীয়তা একটু উপলব্ধি করুন, তাহলে এমনিতেই তাঁর স্মরণ ও বড়ত্ব বর্ণনা করার মাঝে সীমাহীন প্রশান্তি লাভ হবে।

আমাদের সামর্থের উর্ধ্বের এক সফর

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি উভয় জাহানের প্রতিপালক।

সুতরাং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ সত্তার স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর উপরই কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আমরা অনেকেই ই-মেইলের মাধ্যমে পাওয়ার পয়েন্ট এর স্লাইড অবশ্যই পেয়েছি, যাতে ছোট পাতার কোষকে ১০ গুণ বড় করে

দেখানো হয়। এমনিতেই তো এ জগতে আমাদের এ ভূ-মণ্ডল ছাড়াও লক্ষ কোটি গ্রহ-নক্ষত্র এবং ছায়াপথ আপন স্রষ্টার মহত্বর মহত্ব প্রকাশ করে চলছে। চলুন এ ছোট পাতার বিষয় বাদ দিয়ে আপনি যখন আপন প্রভুর সম্মুখে দাঁড়ান, তখন আপন দেহের ভেতরে একটু চলে যান এবং অভ্যন্তরীণ সৃষ্টির প্রতি লক্ষ করুন; কী অপূর্ব নিপুণ সিস্টেম; যা উক্ত মূল্যবান বস্তুকে চালনা করে। (রক্ত পরিচালনা, প্রতিরোধ ক্ষমতা, রগ-রেশা, হরমোন, হৃদয়ের স্পন্দন, ফায়ারিং নিউরান, চামড়া, কলিজা, তিলি, গুরদা ইত্যাদি।)

আপনি একটু আপনার চারপাশে লক্ষ করুন, আমাদের এ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ, এ সাত সমুদ্র, পোকামাকড়ের জগত, এ অনুবীক্ষণ উপাদান ইত্যাদি। একটু আগে বেড়ে যে বস্তু আমাদেরকে ঘেরাও করে আছে এ সকল গ্রহ, আমাদের সূর্য, চাঁদ এবং ছায়াপথ। আরও অগ্রসর হয়ে অগণিত তারকারাজি, ছায়াপথসমূহ এবং ওই জগত, যা আজ পর্যন্ত কোনো চক্ষুই দেখতে পায় না? ফেরেশতা, জিন এবং ওই জগত, যেখানে আমরা পৌঁছতে পারি নাই।

মূলত এটাই শেষ নয় বরং আমাদের সীমিত জ্ঞান মাত্র। এখন এই অনুভূতি নিয়ে একটু পেছনে চলুন। ওখানে আসুন, যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আপনি কি এ জগতের তারকাসমূহ, গ্রহসমূহ এবং ছায়াপথের তুলনায় এক বিন্দু সমান হবেন? এ জগতের তুলনায় আপনার অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্যই নয়। এগুলো তো আমাদের এ জগতের আলোচনা, কুরআন শরিফে এরূপ আরও ছয় জমিন ও আসমান এর বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহর সত্তা এ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান ও রক্ষণাবেক্ষনকারী। তিনি একক, অদ্বিতীয় এ সবকিছুর পরিচালক।

আপনি যখন তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর সাথে কথা বলছেন, তাঁর প্রশংসা করছেন, এখন আপনার অনুভূতিটা কেমন? আপনার কেমন লাগছে, যখন তিনি আপনার প্রত্যেক আয়াতের জবাব দিচ্ছেন? এখনো কি আপনার এতটা দুঃসাহস হয় যে তাঁর আদেশ অমান্য করবেন? এ মহান সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করে কোনো পাপ করার সাহস হয়? তাহলে তার এই সীমাহীন ভালোবাসার কী হবে? তিনি আমাদের কতটা মহব্বত করেন যে, তিনি আমাদেরকে দুনিয়ার কাগজে এক উল্লেখযোগ্য মর্যাদা দান করেছেন, আর তাও শুধু নামাজে খুশু-খুজুর শর্তে।

পরিশেষে তাঁরই তাওফিকে তাঁর আহ্বানে লাব্বাইক বলে নিজেকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়েছি। এটা আমাদের জন্য এমন এক সম্মান, যা কখনো ভোলা যায় না। তাহলে কেন তাঁর জন্য নিজের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যয় করবো না। আমরা কি এত বড় মর্যাদা হতে মুখ ফিরিয়ে তা হতে বঞ্চিত হতে পারি?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মনিবের সম্মান বোঝানোর জন্য এক সুন্দর উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের কুরসি আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর তাঁর কুরসির বিপরীতে সপ্ত আকাশ এরূপ, যেমন বড় এক ময়দানে ছোট একটি আংটি। আর কুরসিটিও আরশের বিপরীতে এরূপই।

পরবর্তী সময় যখন নামাজে দাঁড়াবেন, তখন নিজেকে উপরোক্ত অবস্থানে রেখে দেখুন যে, رَبِّ الْعَالَمِينَ এর প্রকৃত অর্থ তোমাদের বুঝে এসে যাবে।

সুরা ফাতিহার রহস্যাবলী নিয়ে একটু ভাবুন

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

পরম করুণাময়, সীমাহীন দয়ালু।

আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে, উক্ত আয়াত مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (কেয়ামত দিবসের মালিক) এ আয়াতের পূর্বে কেন আসল? আসুন চিন্তা করি। আপনি যদি কোনো ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তার তদন্ত চলে, অথচ আপনি নিরপরাধ। জজ সাহেব আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উক্ত জিজ্ঞাসা দুই ভাবে হতে পারে–

(১) সে আপনার প্রতি অনবরত প্রশ্নের বর্ষণ শুরু করে দেয়। (তুমি ঘটনাস্থলে কেন ছিলে? সেখানে কী করছিলে? সেখানে কখন গিয়েছিলে? তুমি কী দেখেছ? ইত্যাদি ইত্যাদি।) তো যখন এ কঠিন মুহূর্তে আপনি জ্ঞান হারাতে আরম্ভ করেছেন, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন বিচারক আপনাকে বলল, আমি তো জানি আপনি নিরপরাধ, কিন্তু অধিকতর জ্ঞান লাভ করতে চেয়েছি।

(২) অথবা বিচারক শুরুতেই বলে দিলো যে, আমি জানি আপনি নিরপরাধ তবে সব বিষয় আমাকে অবগত করলে অনেক ভালো হবে।

তারপর উক্ত প্রশ্নগুলো শুরু করে দিলো। এ দ্বিতীয় অবস্থায় আপনি বেশি শান্তি ও আরাম অনুভব করবেন। তাই মহান আল্লাহ তাআলা الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ আয়াতটি مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ-এর পূর্বে উল্লেখ করে আমাদেরকে এ বিষয় অবগত করছেন যে, উক্ত বিচারদিনে যে বিচারক বিচারকার্য পরিচালনা করবেন, তিনি الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (পরম করুণাময় অসীম দয়ালু)। এই নাম দু'টি আমাদেরকে নামাজে ওই রকম শান্তি ও আরাম প্রদান করে, যেমনটা তখন অনুভব করি, যখন আমাদের বলা হয় এ ভয়াবহ দিনে আমাদেরকে যার সামনে দাঁড়াতে হবে, তিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু। আমাদের উচিত সর্বদা তাঁর দয়ার উপযুক্ত হয়ে থাকা।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ এর মাঝে এ কথার স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার সীমাহীন দয়া সবকিছুর উপর প্রবল। তাঁর দয়া তাঁর গোস্বার চেয়েও প্রবল। তাঁর রহমতের ছায়া প্রত্যেকের উপর সমান, মুমিন হোক বা কাফের, নেককার হোক বা বদকার। তিনি প্রত্যেককে খাওয়ান, পান করান, বস্ত্র পরিধান করান এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি কাউকে দ্রুত পাকড়াও করেন না, বরং যথেষ্ট সুযোগ দেন যেন মানুষ জীবনের কোনো সময় ফিরে আসে।

সর্ব ক্ষেত্রেই আল্লাহ পাকের দয়া রয়েছে, চাই নেয়ামত দান করুক বা না করুক। তাদের থেকে যদি কোনো নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়, এটাও আল্লাহ পাকের দান। কেননা আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞানে বুঝি না এতে কী হেকমত রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এতেও আল্লাহ পাকের রহমত লুকায়িত রয়েছে।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

আচ্ছা! যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি বে-খবর? তিনি তো গোপন বিষয়ও জানেন এবং সব বিষয়ে অবগত।[৪]

---

৪. সুরাতুল মুলক : ১৪।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

হে মুসলমান! আল্লাহ তোমাদের উপর লড়াই ফরজ করেছেন অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়ত কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয় অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর হয়ত বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন যা তোমরা জান না।[৫]

যখন আমরা الرَّحْمٰنِ বলি তো এটা আল্লাহ পাকের সর্বোচ্চ দয়া যেমন আরবি ভাষায় ওজনের দিক থেকে غضبان، غضب (রাগ) অথবা جوعان، جوع (ক্ষুধা) প্রথম ওজন দ্বিতীয়টির তুলনায় কঠিন রাগ বা কঠিন ক্ষুধা বুঝায়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁর গুণাবলির দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দয়ালু।

মূলত আল্লাহ তাআলার নামসমূহ হতে الرَّحْمٰنِ নামটি সবচেয়ে অধিক ব্যাপক অর্থ বহনকারী।

একটু চিন্তা করুন, তিনি কী নাম নিয়ে নিজকে আরশে সমাসীন বলেছেন,

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.

তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন।[৬]

আল্লাহ তাআলা তাঁর ব্যাপক নামকে নিজের সবচেয়ে বড় সৃষ্টি আরশের সাথে যুক্ত করেছেন।

আর এ নামটি শুধু তাঁরই জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারও নাম الرَّحْمٰنُ হতে পারে না, الرَّحِيمِ নামটিও এরূপ। লোকেরা বরং আবদুর রহমান (রহমানের বান্দা) রাখতে পারে। উপরন্তু আপনারা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'আল্লাহ' নামটিও পাবেন না। এ উভয় নাম তাঁর জন্যই নির্ধারিত।

---

৫. বাকারা : ২১৬।

৬. সুরা ত্বহা : ০৫।

এখন দেখুন الرَّحِيمِ। এর কী অর্থ? তার অর্থ হলো যিনি আপন সৃষ্টির উপর দয়া করেন। আপনি আরও দেখবেন যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে তাঁর এ গুণ ওই সময় ব্যবহার করেছেন যখন বিশেষ করে মুমিনদের প্রতি দয়া করার কথা বর্ণনা করেছেন। আর যখন আমাদের, আল্লাহ পাকের উদারতা এবং মানুষের চাহিদার সঠিক জ্ঞান লাভ হবে, তখন আমরা আল্লাহ তাআলাকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতে সংকোচবোধ করবো না। আমাদের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া আমাদের মতো এর চেয়ে ৭০ গুণ বেশি। الْحَمْدُ لِلّٰه। এখন আমাদের প্রতি তাঁর মর্যাদা, মহত্ব এবং বড়ত্ব পরিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। এখন আপনি নিজেই গভীর অন্তর থেকে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ। এর স্বাদ অনুভব করুন।

একটু সামান্য আঘাত

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.

কেয়ামত দিবসের মালিক।

আল্লাহ তাআলা مَالِك শব্দটিকে কেন নির্বাচন করলেন? কারণ কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ক্ষমতাবান সৃষ্টির সব ক্ষমতা খতম করে দিবেন আর পরিপূর্ণ ক্ষমতা শুধু তাঁরই হাতে হবে। এমনকি কাউকে তার জবান নড়াচড়া করার ক্ষমতাও দিবেন না। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারও জন্য সুপারিশও করতে পারবে না। যেমন আয়াতুল কুরসিতে বর্ণিত হয়েছে।

এ শব্দটি দুই কেরাতে পড়া হয়– (১) مَالِك (মালিকানা) (২) مَلِك (স্বয়ংসম্পূর্ণ বাদশা) এ উভয় অর্থ ওই দিনে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পরিপূর্ণ ক্ষমতার বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ.

যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধায়ী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুত, আল্লাহর আজাব বড় কঠিন।[৭]

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.

সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই, মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তানদের থেকে।[৮]

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ.

সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র।[৯]

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ.

তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে।[১০]

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ.

আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে।[১১]

অতঃপর কে বাঁচবে? কেউ না। আমাদের রব বলবেন,

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ.

আজ কার রাজত্ব?[১২]

কোনো জবাব নেই। আজ রাজত্ব কার? সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। তো আল্লাহ তাআলাই জবাব দিবেন এবং ঘোষণা করবেন,

---

৭. সুরা হজ : ১-২।
৮. সুরা আবাসা : ৩৪-৩৬।
৯. সুরা আম্বিয়া : ১০৪।
১০. সুরা যুমার : ৬৭।
১১. সুরা যুমার : ৬৮।
১২. সুরা গাফের : ১৬।

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

এক আল্লাহর জন্য, যিনি মহা পরাক্রমশালী।[১৩]

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.

দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, অতঃপর সকলে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।[১৪]

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.

আর আপনার পালনকর্তা ও সারি সারি ফেরেশতা উপস্থিত হবেন।'[১৫]

সূর্য মাথার নিকটে করা হবে, যখন একদিন হবে (৫০,০০০) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, তো আমরা ওই দিনের ভয়াবহতা থেকে কীভাবে মুক্তি পাবো? উত্তর সামনে আসছে।

মুক্তির চাবি কাঠি

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

যদি আমরা مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ এর মাঝে চিন্তা করতাম তো এক আয়াতই আমাদের অন্তরে কঠিন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো! অনেক মানুষই নামাজ পড়ে, কিন্তু সে কী করছে সামান্যও চিন্তা করে না। উক্ত শব্দ তাদের অন্তরে পৌঁছে না। বরং এটাকে প্রথাগত কথার মতো সে মৌখিকভাবে শিখে নিয়েছে।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?[১৬]

---

১৩. সুরা গাফের : ১৬।
১৪. সুরা যুমার : ৬৯।
১৫. সুরা ফাজর : ২২।
১৬. সুরা মুহাম্মাদ : ২৪।

বলা হয়েছে যারা গভীর চিন্তা করে এবং যার অন্তর নামাজে এমনভাবে বিনয়ের সাথে লেগে থাকে যেমন পানিতে মাছ, আর যাদের এরূপ হয় না তারা যেন পিঞ্জিরায় আবদ্ধ পাখি। অতএব নামাজ দ্বারা কীভাবে ওই দিনের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে পারবো? সামনের আয়াতেই এর জবাব রয়েছে, যা মূলত সুরা ফাতিহার সারমর্ম ... কুরআনের এক মহান সুরা; সুরাতুল ফাতিহা-ই হচ্ছে পূর্ণ কুরআনের খোলাসা বা সারনির্যাস।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ প্রত্যেক নবি তাদের উম্মতকে মুক্তির একই চাবি দিয়েছেন,

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ.

যে আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে কঠিন আজাবের আশঙ্কা করি।[১৭]

এখন বলুন, এ দুনিয়াতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত? শুধু আল্লাহর ইবাদত ছাড়া আর কিছু না। এজন্যই আমাদের সৃষ্টি। উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল করার উপায় কী? দিলের ইখলাস! আমরা যা কিছু করি বা করবো শুধু আল্লাহর জন্য করবো আর কারও জন্য নয়। সদা তাঁর সন্তুষ্টির কামনায় থাকবো। কেননা ইখলাসবিহীন আপনি ওই মুসাফিরের মতো, যে পথের সম্বল হিসেবে কিছু বালু বেঁধে নিয়ে চলছে, যা শুধু একটি বোঝা ছাড়া কিছু নয়। শুধু আল্লাহকে নিজের আশ্রয়ের স্থল বানাও অন্য কাউকে নয়। কেননা অন্যরা যা করে বা চিন্তা করে সব অনর্থক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ না কোনো উপকার করতে পারে, না ক্ষতি।

আপনাকে যখনই জিজ্ঞাসা করা হবে এ আমল কেন করেছ? তখন উত্তর একটিই আসবে যে, আল্লাহর জন্য। আর যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বাস্তবেই, নাকি অন্য কারও জন্য? তো কঠিনভাবে উত্তর আসবে অন্য কারও জন্য নয়।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

---

১৭. সুরা হুদ : ২৬।

বলুন আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয় অথচ তারা মনে করে যে তারা সৎ কর্ম করছে।[১৮]

আল্লাহর জন্য ইখলাস আপনার জীবনকে পরিবর্তন করে দেবে। এখন সময় এসেছে আমাদের নিয়তকে খালেস করার। সময় এসেছে আমাদের সন্তানদের শিখাবার যে, তুমি যে কাজই করবে তা এ জন্য যে, আল্লাহ যেন তা পছন্দ করেন! এবং যে কাজ থেকে বিরত থাকবে, তা এজন্য যে, আল্লাহ এতে অসন্তুষ্ট। তারা যেন এটা শিখে নেয় যে, তাকে পুরস্কার দান করবেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া অন্য কেউ নয়। একথা সত্য যে, নিয়তের মাঝে পরিপূর্ণ ইখলাস সৃষ্টি করা সহজ নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়। কেননা আমাদের ওই জাদুময় কালেমা জানা আছে, যা ইখলাসের উৎস। অর্থাৎ, আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

যদি আল্লাহ পাকের মদদ থাকে তবে এমন কোনো কাজ নেই যা আঞ্জাম দেয়া যাবে না, সবকিছুই তাঁর হাতে। চেয়ে নাও, তিনি দেবেন। তিনি কি এ কথা বলেননি যে, তোমরা সকলে পথভ্রষ্ট; তবে আমি যাকে হেদায়েত দেই। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এটা ওই আয়াত, যার উপর আমাদের পূর্বসূরীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদতেন। একদা তাদের একজন মক্কা শরিফে নামাজ পড়াচ্ছিলেন, তার বন্ধু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাওয়াফ করলেন, যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন দেখলেন তিনি এ আয়াতই পড়তেছেন আর বার বার কাঁদছেন। এমনকি সূর্য উদয় হয়ে গেল, আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আসুন এতে আরও চিন্তা করি, তাহলে ওই নেফাক অন্তর থেকে চলে যাবে, যা অজ্ঞাতসারে আমাদের অন্তরে লেগে আছে। এটি এক বিরাট দুআ, যা আপনি কখনো করেছেন!

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখান।

এখন আমরা সবচেয়ে মহান হেকমতপূর্ণ এবং ব্যাপক দুআ পর্যন্ত পৌঁছেছি। যা আমরা হয়তবা কখনো চেয়েছিলাম। যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে

---

১৮. সুরা কাহফ : ১০৩-৪।

সরল পথের হেদায়াত করে থাকেন তাহলে বুঝে নাও যে, তিনি আমাদেরকে যেভাবে তাঁর হক আদায় হয়, সেভাবে ইবাদত করারও তাওফিক দিয়েছেন। (একটু স্মরণ করুন, পূর্ববর্তী আয়াতে আপনি কী চেয়েছিলেন? অর্থাৎ, আমরা আপনারই ইবাদত করি। আপনার কাছেই সাহায্য চাই।)

একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়, যে সুরা ফাতিহা আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে প্রয়োজনাদি চাওয়ার অতি উত্তম পদ্ধতি শিখিয়েছে। আমাদেরকে সহিহ তরিকায় দুআ করা শিখিয়েছে। যেন তিনি আমাদের কথা শোনেন ও আমাদেরকে দান করেন। আমরা তাঁর শান হিসেবে তাঁর আজমত ও বড়ত্ব বর্ণনা করি। তারপর আমাদের আবেদন পেশ করি। এখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে পথের প্রয়োজন সেটা হলো صِرَاطَ 'সরল সঠিক পথ' কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এ পথে চলা খুবই মুশকিল। এ পথের কিছু বিশ্লেষণ আছে। যার কিছু আমরা জানি, আর কিছু জানি না (কোনটি হালাল, কোনটি হারাম, কোনটি সহিহ, কোনটি বাতিল?) আর যা আমরা জানি, না জানার তুলনায় অনেক কম। আমরা যা জানি তা হতে কিছু শরীর দ্বারা আদায় হয়, যেমন হজ, রোজা ইত্যাদি। আর কিছু শরীর দ্বারা আদায় হয় না। এগুলো থেকে কিছু আমরা আনন্দের সহিত আদায় করি, আর কিছু আদায় করতে নফসের খুব কষ্ট হয়, যেমন ফজর নামাজের জন্য জাগ্রত হওয়া ইত্যাদি।

সাথে সাথে উক্ত আমলগুলো আদায় করতে যে ইখলাসের প্রয়োজন, কখনো সে ইখলাস পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়, আবার কখনো মোটেও পাওয়া যায় না। কখনো সে আমল পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় আদায় হয়, আবার কখনো এতে ত্রুটিও হয়।

আমরা যদি পূর্ববর্তী প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পরিপূর্ণ করি, অর্থাৎ ইলম, ইখলাস, সুন্নতে নববির গুরুত্ব ইত্যাদি, তবুও একটি বিষয়ের কমই থেকে যাবে। আর তা হলো এস্তেকামাত বা দৃঢ়তা। যেন প্রত্যেকবার তা ওইভাবে আদায় করা যায়। এখন বুঝে আসছে কি? আমরা সরল পথে চলার জন্য আল্লাহর হেদায়াতের প্রতি কেন মুহতাজ?

আপনি দেখেছেন কি, আমরা আল্লাহর হেদায়েত ছাড়া তা করতে পারবো না? আপনি কি বুঝেছেন এ দুআ কত ব্যাপক?

আপনি তো জানেন صِرَاطَ দুটি। একটি এ দুনিয়াতে যার আলোচনা মাত্র করা হয়েছে, দ্বিতীয়টি আখেরাতে যা তরবারির চেয়ে ধাঁরালো, যা জাহান্নামের আগুনের উপর স্থাপিত। প্রত্যেক জান্নাতিকে তার উপর দিয়েই যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা। অতঃপর আমি পরহেজগারদের উদ্ধার করবো আর জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।[১৯]

আমরা যদি এ দুনিয়ার 'সিরাতে' মজবুত ও দৃঢ়তার সাথে চলতে পারি, তবে আখেরাতের উক্ত সিরাত সহজভাবে অতিক্রম করতে পারব। অর্থাৎ দ্বিতীয় সিরাত সরাসরি সম্পৃক্ত এ দুনিয়ার ইমান, ইখলাস ও আমলের সাথে। আমাদের ইমান, আমাদের নেক আমল আখেরাতে ঘোর অন্ধকারে উক্ত পুলসিরাতে আমাদের জন্য আলোর কাজ দিবে।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ.

যেদিন আপনি দেখবেন ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটাছুটি করবে।[২০]

তাই তার ইমান ও আমল অনুপাতে কিছু বিদ্যুতের ন্যায় অতিক্রম করে যাবে, কিছু উজ্জ্বল তারকার মতো, কিছু বাতাসের মতো, কিছু দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো এবং কিছু দৌড়ে অতিক্রম করবে, আর কিছু হাত-পা দিয়ে হেঁচড়ে যাবে। বাকি সব জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করবেন, হে আমার পালনকর্তা! তাদেরকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! তাদের ছেড়ে দিন। এ জীবনের 'সিরাত' আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবে, আর ওই জীবনের সিরাত আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে।

---

১৯. সুরা মারয়াম : ৭১-৭২।

২০. সুরা হাদিদ : ১২।

আপনি কি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এ দুআ কতই না গুরুত্বপূর্ণ। اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ আমাদের পূর্ণ অস্তিত্ব এর উপর সীমাবদ্ধ।

উল্লিখিত বিষয়গুলো জানার পর যখন আপনি امين বলবেন, তখন এ আওয়াজ অন্তর হতে বের হবে, কেন হবে না? প্রকৃত বিষয় তো এটাই যে, প্রত্যেক দুআ কবুলের এটিই হলো শর্ত। তা হলো একাগ্রতার সাথে অন্তর থেকে বের হওয়া। আগ্রহহীন অন্তরের দুআ আল্লাহ শোনেন না। সুরা ফাতিহার সমাপ্তি :

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

ওই লোকদের পথ, যাদের প্রতি আপনি করুণা করেছেন, তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গোস্বা হচ্ছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

সুরা ফাতিহার সমাপ্তিতে তার শেষ আয়াতের সমপনী ব্যখ্যা উপস্থাপন করছি। 'সিরাত'-এর ব্যাখ্যার পর আলোচনা হয়েছে, উভয় জাহানে সফলতা লাভ করতে কীভাবে তার উপর দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ পাকের দয়া ও হেদায়েতের প্রয়োজন।

যেহেতু নেক লোকদের সাহচর্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের আখলাক, স্বভাব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইমানের উপর বদ্ধমূল থাকতে পারি, তাই আল্লাহর কাছে দুআ করা হয়, তিনি যেন আমাদেরকে ওই পথ প্রদর্শন করেন, যাদের উপর তিনি করুণা ও দয়া করেছেন।

এই আয়াত আমাদের পূর্বে যারা চলে গেছেন সকল নেককার নারী-পুরুষদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন আম্বিয়া, সালেহিন, সাহাবা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও। উক্ত নেক লোকদের প্রচেষ্টা আমাদের জন্য সান্ত্বনার কারণ। এগুলো আমাদের বিপদাপদসমূহকে সহনশীল করে তোলে এবং এর দ্বারা এ ব্যাপারে আমাদের শক্তি ও সজীবতা লাভ হয় যে, ইনশাআল্লাহ আখেরাতে আমরা উক্ত নেক লোকদের সাথে থাকব।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ এরা এমন লোক, যারা ভালোভাবেই সত্য সম্পর্কে অবগত এবং কোনটা সঠিক কোনটা বাতিল তাও জানে। তারপরও গ্রহণ করা ও মেনে নেয়া থেকে দূরে থাকে। অর্থাৎ তারা জানে, কিন্তু অন্তরে গ্রহণ

করে না। যেমন ওই সকল লোক, যারা জানে যে, নামাজ ফরজ, কিন্তু আদায় করে না। এরা ওই সমস্ত লোক, সত্য সম্পর্কে যাদের যদিও পুরোপুরি জ্ঞান নেই, কিন্তু তারা বুঝতেও চায় না। সুতরাং তারা ভুল পথেই চলতে থাকে। যেমন ওই সমস্ত লোক, যারা নামাজ পড়ে ঠিকই, কিন্তু অনাগ্রহের সাথে। আপনি কি এবিষয়ে গভীর চিন্তা করেছেন যে, রহমত ও বরকত শব্দদ্বয় কেবল রাব্বুল ইজ্জতের সাথেই নির্দিষ্ট। أَنْعَمْتَ যাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও দয়া রয়েছে। তবে 'গজব' শব্দটি শুধু আল্লাহর সাথে সীমাবদ্ধ নয়। এরূপ এজন্য যে, যখন অনুগ্রহ ও দয়ার বিষয় আসে, তো তার দাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা, কিন্তু যখন গুনাহ প্রকাশ পায়, তখন শুধু আল্লাহ পাকের নয়, বরং অন্যান্য মাখলুকের গোস্বারও ভাগী হয়। যেমন- ফেরেশতা, আম্বিয়া এবং নেককার লোকদের।

পরিশেষে امين এর অর্থ হে আল্লাহ! তুমি আমার দুআ কবুল করো। امين এর মাধ্যমে আমরা যার হাতে আমাদের হেদায়েত ও পথ প্রদর্শন এবং মুক্তি নির্ভরশীল তাঁর দরবারে কাতর মিনতি করি। সুতরাং অন্তরের অন্তস্থল হতে আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করো। ওই ব্যক্তির মতো, যাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, আর সে নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে অত্যন্ত কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আপনার আওয়াজে ওই পরিমাণ উন্মাদনা ও উদ্দীপনা থাকা চাই এবং অন্তর এমন হওয়া চাই যে, সে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। অন্তরের গভীর থেকে আমিন বলার আরেক মজবুত কারণ এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের 'আমিন' যদি ফেরেশতাদের আমিনের সাথে মিলে যায় তো আল্লাহ তাআলা তোমাদের পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

একটু শুনুন! আল্লাহ তাআলা বলেন আমি সালাত (সুরা ফাতিহা)-কে আমার ও বান্দার মাঝে ভাগ করে নিয়েছি। আর আমার বান্দা যা চায় তা পাবে।

আগামীতে আপনি যখন নামাজের জন্য দাঁড়াবেন এবং সুরা ফাতিহা পড়বেন তো প্রত্যেক আয়াতে ওয়াকফ করবেন, যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। কারণ সে মহান সত্তা আপনার সামনে তাঁর বরকতময় চেহারা নিয়ে উপস্থিত এবং আপনার প্রত্যেক আয়াতে জবাব দিচ্ছেন। ব্যস এটা কল্পনা করুন। কতই না গর্বের বিষয় ওই মহান সত্তার ক্ষুদ্র গোলাম হওয়ার মধ্যে।

অন্তর থেকে তেলাওয়াত করুন

এখন আমরা আল-ফাতিহা শেষ করে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করছি। আপনি কি কখনো এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন যে, আমরা দাঁড়ানো অবস্থায় কেন কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করছি? নামাজের অন্য হালতে ফাতিহা বা কুরআন শরিফ তেলাওয়াত কেন করি না? যেমন রুকু, সেজদা কিংবা অন্য কোনো অবস্থায়?

দাঁড়ানোর অবস্থাটা প্রত্যেক মুসলমানের মর্যাদাপূর্ণ, গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং আদবপূর্ণ। কুরআনের কালামও সবচেয়ে সম্মানি, গাম্ভীর্যপূর্ণ ও আদবপূর্ণ তাই তাকে সবচেয়ে মর্যাদাশীল ও আদবপূর্ণ অবস্থায় পড়া চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তাঁকে রুকু ও সিজদা অবস্থায় কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন আল্লাহ পাকের কালাম, যা অত্যন্ত উঁচুমানের তাই তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে পাঠ করা অধিক শ্রেয়। তবে জানি না, আমরা কতবার মনোযোগ ছাড়া, অনুভূতিহীন অবস্থায় এবং তার মর্যাদাপূর্ণ শব্দসমূহ বোঝা ছাড়া তেলাওয়াত করেছি? আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন, যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যা তেলাওয়াত করা হলো এতে আল্লাহ তাআলা কী কী নিষেধ করেছেন এবং কী কী আদেশ করেছেন? তো আমাদের পক্ষ থেকে এর কোনো সঠিক উত্তর আসবে না।

আমাদের তো খেয়ালই থাকে না যে ইমাম সাহেব কী পড়ছেন। তিনি হয়তো জান্নাত-জাহান্নামের বিষয় পড়ছেন। আর আমরা চিন্তা করছি খানা-পিনার বিষয়। যদি কোনো শক্তিশালী বাদশার ঐতিহাসিক ইন্টারভিউ আমাদের থেকে নেয়া হয়, আমরা তাতে কত অধিক মনোযোগ দেবো? শুধু কান দিয়ে শুনব না, বরং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাতে লেগে যাবো। কেন আমরা তাতে এত বেশি হারিয়ে যাবো? সম্ভবত তাঁর প্রত্যেকটি কথা স্মরণ রাখার চেষ্টা করবো। তবে যখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নামাজে আমাদের সাথে কথোপকথন শুরু করেন, তখন কেন এত অবহেলা? আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

এরা কুরআনে গভীর চিন্তা করে না, এদের অন্তরে তালা লেগে গেছে।[২১]

---

২১. সুরা মুহাম্মদ : ২৪।

এ কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে যদি আন্তরিক একাগ্রতা না থাকে, তাহলে অন্তরে আল্লাহ পাকের বাণীর কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। মনে রেখ, এটা কোনো বড় বিষয় নয় যে, আমরা কুরআন পড়ি, বরং চূড়ান্ত উৎকর্ষতা হলো যে, আমরা কতটা একাগ্রতার সাথে পড়ি এবং উপদেশ গ্রহণ করি? একবার নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আয়াত বার বার পাঠ করতে করতে, কেঁদে কেঁদে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটি হলো—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার বান্দা এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।[২২]

সুতরাং, আমাদের উচিত মনোযোগ সহকারে পড়া। এ বিষয় কল্পনা করে যে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলছেন, আর আমরাও আল্লাহর সাথে কথা বলছি। তবে, আমরা কীভাবে বুঝাবো যে, কোন আয়াতে কী ধরনের অনুভূতি গ্রহণ করা চাই? আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. আমাদেরকে এরূপ কিছু মৌলিক নিয়মনীতি বাতলে দিয়েছেন, যা আমাদেরকে পথ দেখাবে। যদিও আমরা উক্ত আয়াতের পূর্ণ তাফসির সম্পর্কে অবগত না হই। তিনি বলেন–

- যদি কোনো আয়াত তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের বর্ণনা করে তাঁর নাম ও সিফাতের মাধ্যমে, তবে তোমাদের অন্তর মহব্বত দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাওয়া চাই।

- যদি কোনো আয়াত আল্লাহ পাকে রহমত, ক্ষমা এবং জান্নাতিদের আলোচনা করে, তবে তোমাদের অন্তর আনন্দ, প্রশান্তি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ভরে যাওয়া চাই।

- যদি কোনো আয়াত আল্লাহ পাকের গোস্বা, শাস্তি, ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের আলোচনা করে, তবে তোমাদের অন্তর ভয় ও পেরেশানি দ্বারা ভরে যাওয়া উচিত।

---

২২. সুরাতুল মায়িদা : ১১৮।

■ সুতরাং আল্লাহর কালাম পড়ার সময় আমাদের অন্তরে সর্বদা মহব্বত, আশা এবং ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া চাই। কুরআন আমাদের জ্ঞানের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে।

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।[২৩]

নিজের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন পূরণ করবো

আমি আমার কেরাত পূর্ণ করেছি। এখন কিছুক্ষণ থেমে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবো। সুতরাং এখন সময় হচ্ছে এলোমেলো মনকে পুনরায় স্থির করার। মনে মনে কল্পনা করতে হবে যে, আমরা এখানে জমিনে নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছি, আর আল্লাহ তাআলা আমাদরেকে সাত আসমানের উপর থেকে দেখছেন। তাই আমাদের নামাজ সুন্দর হওয়া চাই। বিশেষত রুকু, কেননা আল্লাহ তাআলা সুন্দর, সৌন্দর্যকে তিনি পছন্দ করেন। আজ আমাদের সাক্ষাত মহান আল্লাহ পাকের সাথে হবে। তাই আসুন আমাদের নামাজকে অধিক সুন্দর ও পরিপূর্ণ করি।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ.

আমার রব মহান (সকল দোষ থেকে) পবিত্র।

নিজের হাত দ্বারা হাঁটু ধরুন, আঙুলগুলো ফাঁকা থাকবে, পিঠ, মাথা, নিতম্ব বরাবর থাকবে। শরীরের প্রত্যেক জোড়া আপন স্থানে আসা পর্যন্ত এ অবস্থায় নিজেকে স্থির রাখবে। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ এর মাঝে বিদ্যমান সত্তার প্রতি গভীর মনোযোগ দিবে। এটা আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত সৃষ্টির উপায়। তিনিই আমাদের রব, যিনি আমাদেরকে আপন দয়ায় বড় করেছেন, কাপড় পরিয়েছেন, খাইয়েছেন এবং সুস্থতা দান করেছেন। অন্তর

---

২৩. সরা হাশর : ২১।

থেকে বের করুন سُبْحَانَهُ অর্থাৎ ওই সত্তা, যিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ এভাবে যখন দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার বলবে, তখন আপনার অন্তর মহব্বত ও একনিষ্ঠতায় ভরপুর হয়ে যাবে। তাঁর বড়ত্বকে অনুভব করুন, তাঁর সর্বময় ক্ষমতাকে স্মরণ করুন, হে প্রতিপালক! আমার সকল আশা-ভরসা তোমারই সাথে সম্পৃক্ত করছি।

আমরা অনেকে নামাজের এই অংশটুকু মেশিনের মতো দ্রুত আদায় করি। ফলে না কোনো অনুভূতি সৃষ্টি হয়, না আল্লাহর সাথে কোনো বন্ধন। যেমনটা হয়ে থাকে কেরাত ও সেজদায়। অথচ রুকু ইবাদতের বিশেষ অংশ। আমাদের রবের প্রতি আমাদের দাসত্বের প্রমাণ। যাতে রয়েছে উচ্চ পর্যায়ের অক্ষমতা ও নম্রতার অনুভূতি। ওই সময়ের আরবরা বিষয়টি জানতেন এবং তাদের মধ্যে অহংকারীরা এর কঠিন বিরোধিতা করত। এক ব্যক্তি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদনও করেছেন যে, সে রুকু না করে সরাসরি সেজদায় চলে যাবেন।

আমাদের প্রত্যেকেরই একটা ব্যক্তিগত খায়েশ থাকে, ইচ্ছা থাকে। কারও এ খায়েশ যে, সকলে আমাকে মহব্বত করবে। কারও কিছুক্ষণ একাকিত্ব হাসিল হওয়া। কারও খায়েশ সারা দিন কঠিন পরিশ্রমের পর যখন ঘরে যাবো, তখন সেখানে আমার জন্য কেউ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে। আবার কারও এ কামনা যে, সন্তানদের সাথে সময় কাটাবো এবং তাদেরকে আদর যত্ন করবো। কারও এ চাহিদা যে, সুন্দর সুন্দর উপাধি পাবো ইত্যাদি। যখন উক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, তখন আমাদের মাঝে এক ধরনের হতাশার অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং সারাদিন খারাপ হয়ে যায়। বারবার বিস্বাদময় কথা বলি ও মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, কিন্তু জানি না এরূপ কেন হচ্ছে। কারণ আজ আমাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি।

এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যা আমাদের সকল প্রয়োজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। উক্ত প্রয়োজন পূরণার্থে এক সময় মানুষ অনেক বস্তুর পূজা করত। যেমন– সূর্য, চাঁদ, প্রাণী, বানর, সাপ, বিজ্ঞান এমনকি আপন প্রবৃত্তিরও পূজা করত। সে জন্য তাদের শক্তি ও সম্পদ উজাড় করে দিত। এ উদ্দেশ্য পুরা হওয়া চাই, কিন্তু এ উদ্দেশ্য ওই পর্যন্ত পুরা হবার নয়,

যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার ইলাহের ইবাদত না করা হয়। আর নামাজ উক্ত উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম, যার মধ্যে রুকু হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমাদের পূর্বসূরী বুজুর্গগণ রুকুতে এত শান্তি ও মজা পেত যার কারণে তারা রুকুকে এত দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন, যেমন কিয়ামকে দীর্ঘ করে থাকেন। এক সাহাবি বলেন, আমি নামাজে সুরা ফাতিহার পর সুরা বাকারা, আলে ইমরান, সুরা নেসা তারপর সুরা মায়েদাও পড়েছি অথচ এ পর্যন্ত আমার নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. রুকুতেই ছিলেন।

একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাজে তাড়াহুড়া করতে দেখেন যে রুকু, সেজদা খুব দ্রুত করছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি এ ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যায় তবে তার মৃত্যু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের উপর হবে না। তাই আমাদের রুকু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো অত্যন্ত ধীরস্থিরতার সাথে আদায় হওয়া চাই। দুনিয়ার জীবন কষ্ট ক্লেশে ভরা যেখানে একদিন খুশির হাসি আরেক দিন দুঃখের কান্না। তার প্রয়োজনাদি ও ব্যস্ততা আমাদেরকে ক্লান্ত করে রাখে।

নামাজের চেয়ে বড় আর কোনো জিনিস আছে যা এ দুনিয়ার ক্লান্ত দূর করতে পারে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, ঠিক মতো রুকু আদায় করে না তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো যে অনেক কষ্ট করে এক দুইটি খেজুর খাবার জন্য পায় যা তার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না। আসুন আমরা নিজেদের আরাম ও শান্তি রুকু ও সেজদায় তালাশ করি। আমরা দিনে ১৭ বার আল্লাহর দরবারে ঝুঁকি; পাশাপাশি সে অনুযায়ী আল্লাহর মহব্বতও বৃদ্ধি পাওয়া চাই। আর আপনি যখন তাঁকে মহব্বত করবেন তো তিনি এর চেয়েও অনেক বেশি আপনাকে মহব্বত করবেন। কেননা তিনি অত্যধিক দয়ালু ও দাতা। আর আপনার খালেক যখন আপনাকে মহব্বত করে তবে কে আপনাকে কষ্ট পৌঁছাবে?

নামাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের প্রস্তুতি

আমরা নামাজের সবচেয়ে সৌন্দর্যপূর্ণ মুহূর্ত রুকু অতিক্রম করেছি। রুকু হলো সেজদার অগ্রদূত। আনুগত্যের এক পদ্ধতি হতে আরেক পদ্ধতির দিকে প্রত্যাবর্তন। আনুগত্যের দিক থেকে যা সবচেয়ে পরিপূর্ণ। তবে আমরা সেজদায় যাওয়ার আগে নামাজের আরেক সুন্দর অবস্থায় প্রবেশ করি; তা হলো রুকু থেকে দাঁড়িয়ে স্থির হওয়া। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ ওই ব্যক্তির নামাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, যে সেজদায় যাওয়ার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। তাই যে স্থিরতা ও প্রশান্তি আমরা নামাজের অন্যান্য অবস্থায় গ্রহণ করি, এখানেও তা করতে হবে। দেহের অঙ্গ ও জোড়াসমূহ যথাস্থানে আসতে দিতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটাই করতে বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো, যে তার নামাজে চুরি করে (অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে আদায় করে)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর পর ওই পরিমাণ দাঁড়াতেন, যে পরিমাণ রুকুতে দেরি করতেন,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

আল্লাহ তাআলা শুনেছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে।

এবার যখন দাঁড়াই তো আল্লাহু আকবার না বলে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলি কেন? স্মরণ করুন, আমি কী বলেছিলাম? আপন মালিকের সামনে যাওয়ার প্রত্যেক দুআ তার সঠিক পদ্ধতি ও তারতিব অনুযায়ী হওয়া চাই; যার শুরুতে প্রশংসা ও বড়ত্বে বর্ণনা থাকা চাই, স্মরণ এসেছে? যে ভাবে সুরাতুল ফাতিহায় صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْم এর দুআ চাওয়ার পূর্বে প্রশংসা করা হয়েছিল। এখানেও তদ্রূপ করা চাই। যেহেতু এখন আমরা নামাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ সেজদার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে আমরা আল্লাহ পাকের অধিক নিকটবর্তী হতে পারব। আর যখন সবচেয়ে বেশি দুআ কবুল হয়। তাই سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ আমাদেরকে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে যে, দুআর পূর্বে আল্লাহ পাকের প্রশংসা বর্ণনা করো। অতঃপর রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর উক্ত ইঙ্গিতে বলি-

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ.

হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, সর্বাধিক ও উত্তম প্রশংসা, যাতে বরকত রয়েছে।[২৪]

আমরা আমাদের প্রশংসার শুরু رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ -এর দ্বারা করছি, যার অর্থ হে আমাদের প্রতিপালক! সর্বপ্রকার প্রশংসা তোমারই জন্য। আমরা সামনে এটাও বাড়াতে পারি— حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়াচ্ছিলেন, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের একজন উপরোক্ত বাক্য বৃদ্ধি করলেন। حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ

যখন নামাজ শেষ হলো, তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্য হতে এ শব্দগুরো কে বলছিলে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি বলেছিলাম হে রাসুল! নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি দেখেছি যে ত্রিশের কাছাকাছি ফেরেশতা তার সওয়াব লেখার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লেগে গেছেন।

আমরা একটু অগ্রসর হয়ে উপরোক্ত দুআও পড়তে পারি।

مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

প্রশংসা যা আসমান ভরে দেয়, জমিন ভরে দেয় এবং এ উভয়ের মাঝে প্রত্যেক বস্তুকে ভরে দেয় এবং প্রত্যেক ওই বস্তুকে, যা আপনি চান।[২৫]

এ দুআতে مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ 'যা আপনি চান'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সকল মাখলুকাত যা আমাদের চিন্তার ঊর্ধ্বে যেমন আরশ, কুরসি ইত্যাদি অথবা যে বিষয়ে জ্ঞান এখনো আমাদের হয়নি। উক্ত শব্দসমূহ দ্বারা আমরা আমাদের খালেকের তুলনায় আমাদের স্বল্পজ্ঞানের স্বীকৃতি দিচ্ছি।

নামাজে আলাদা শব্দে বিভিন্ন দুআ আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। আসুন আমরা 'হামদ' বর্ণনা করি এবং করতেই থাকি। তবুও আল্লাহ তাআলার প্রশংসার হক আদায় করতে পারব না। কেউ তাঁর প্রশংসার হক

---

২৪. মুআত্তা মালেক : ২/২৯৫।

২৫. আবু দাউদ : ১/১২৯।

আদায় করতে পারবে না এবং তাঁর তারিফের পূর্ণ জ্ঞান কারও নেই একজন ছাড়া। আপনি কি জানেন তিনি কে? তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, যিনি আপন শান অনুযায়ী হক আদায় করে নিজের প্রশংসা করতে পারেন। আল্লাহ তাআলার এমন অনেক গুণাবলী রয়েছে, যার জ্ঞান কোনো মাখলুক বা মানুষের নেই। শুধু আল্লাহ পাকেরই রয়েছে। তার বড়ত্ব আমাদের বিবেক-বুদ্ধির অনেক ঊর্ধ্বে।

প্রকৃত আনন্দ কীভাবে অর্জিত হবে

আমরা আমাদের রুকু পূর্ণ করে দাঁড়িয়েছি। এখন আমরা নামাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন আদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এ রুকন আমাদের নামাজের আকর্ষণীয় সমাপ্তি। পূর্বের সব রুকন এ রুকন পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম ছিল। সমাপ্তির মূল লক্ষ্য সেজদা। সেজদার কী অর্থ? আমাদের অধিকাংশই বছরের পর বছর ধরে মেশিনের ন্যায় দ্রুত সেজদা আদায় করি। তাই তার প্রকৃত ফলাফল হতে অজ্ঞ রয়ে গেছি। নামাজের কোনো রুকন আদায়ে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মজা পাবো না, যতক্ষণ না ইখলাসের সাথে আদায় করব। সেজদা আপন খালেকের দরবারে দাসত্বের বড় প্রমাণ। যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে। এটা এরূপ যে, আমরা আপন রবকে জিজ্ঞাসা করছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমার কাছে কী চান? আমরা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু আপনাকে দিচ্ছি, আমি নিজের সবচেয়ে দামি ও সম্মানী বস্তু আপন চেহারাকে সবচেয়ে নিচু স্থানে রেখে দিয়েছি। হে প্রতিপালক! শুধু আপনার জন্য আমার সবকিছু বিসর্জন দিচ্ছি।

সেজদা, প্রকৃত আনন্দ ও প্রশান্তি লাভের এক সূক্ষ্ম ভেদ। তা কীভাবে? একটু ভাবুন, সীমাহীন আনন্দের স্থান হলো জান্নাত, তা কোথায়? সাত আকাশের উপর, আল্লাহ পাকের নিকট। জাহান্নাম যেটা অনেক মসিবতের স্থান, তা কোথায়? সম্পূর্ণ নিচে আল্লাহ তাআলা হতে অনেক দূরে। জান্নাতের দরজা বদকারের জন্য কখনো খোলা হবে না। সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার জান্নাত কোনটি? যা সর্বোচ্চ শান্তির স্থান। উক্ত স্থানকে الأعلى الفردوس বলা হয়। যা আম্বিয়ায়ে কেরামের স্থান। যার ছাদ আল্লাহ পাকের আরশ। এটা জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু স্থান, আল্লাহ পাকের খুব কাছেও। সহজ কথা হলো ওখানে অবস্থানকারীরা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পড়শী।

এখন একটু চিন্তা করুন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় সবচেয়ে বেশি কঠিন সময় অতিক্রম করেন, যেখানে সীমাহীন চিন্তা ও অক্ষমতা অনুভব করছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে কীভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং উক্ত মুহূর্তগুলো সর্বদার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। মেরাজের রাত্রিতে তিনি তাঁর রবের এত নিকট পৌঁছলেন, যা কোনো মানুষের জন্য সম্ভব নয়। আজও যখন কোনো বস্তু, কোনো শব্দ বা কোনো আমল খুশির কারণ হয়, তবে এ দুআ শেখানো হয়, সকল ভালো শব্দ ও ভালো আমল তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে তিনিই সর্বোচ্চ।

সুতরাং প্রকৃত শান্তি কোথায়? তা উপরে আল্লাহ তাআলার কাছে। তার নিয়ম এরূপ যে, যত বেশি আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হবে তার আধ্যাত্মিক শক্তিও ওইরূপ বৃদ্ধি পাবে। শান্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আমরা এ শান্তির উচ্চ মর্যাদা কীভাবে লাভ করব? আমাদেরকে উপরওয়ালার নিকটবর্তী হতে হবে। আমরা এটা কীভাবে করতে পারব? নিজেকে তাঁর সামনে ছোট করে। এ হাদিস একটু স্মরণ করুন– যে আল্লাহর সামনে নিজেকে ছোট করবে আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তার আনন্দ বৃদ্ধি করবেন।

এ হাদিসটিও একটু চিন্তা করুন– বান্দা আপন রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হন সেজদার অবস্থায়।

আল্লাহ তাআলা সুরাতুল আলাকের শেষে বলেন, সেজদা করো, আল্লাহর নিকটবর্তী হও।

আপনার কি বুঝে এসেছে যে, আপনি সারাজীবন কী করেছেন? আপনার প্রতিটি সেজদায় আপনার রবের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার দেহ তো জমিনে পড়ে থাকে, কিন্তু রূহ রবের কাছে উপরে উঠছে। যেন রবের নিকটবর্তী হওয়া যায়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বেশি বেশি সেজদা করো, কেননা কোনো মুসলমান যখনই সেজদা করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করেন।

এমনকি সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে ফেলে। অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করে। যাকে আল্লাহর আরশ বেষ্টন করে আছে। যা আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থান।

একটি প্রমাণ দেখুন। একদা রবি বিন কাআব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওজুর পানি আনলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কিছু চাও, উত্তরে রবি রাযি. বললেন, আমি জান্নাতে আপনার সাথী হতে চাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অন্য কিছু চাও। রবি রাযি. বললেন, আমি শুধু এটাই চাই। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশি বেশি সেজদা করে আমাকে সাহায্য করো। এখন বুঝুন যে, আপনি আপনার ইমানি মর্যাদা উঁচু হতে উচ্চতর করার জন্য আপন সত্তাকে সর্বনিম্নে আনা আবশ্যক। আর আপনার দেহ যখন সেজদা করে, তখন এ বিষয়ের কল্পনা করবেন যে, আমার মনও তার সাথে জড়িয়ে আছে। এই সেজদা ওই সত্তার দরবারে করা হচ্ছে, যিনি আরশে সমাসীন আছেন। দৈনিক দুনিয়ায় সকল কার্যাদি আঞ্জাম দেন, যার সামনে আমাদের ভালো মন্দ সকল কর্ম পেশ হয়। তাঁর কাছে প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাঁর কারও নিকট কোনো প্রয়োজন নেই। যিনি সর্বদা কাউকে সাহায্য করেন, কারও ভগ্ন হৃদয়ে জোড়া লাগান, কোনো দুর্বলকে শক্তিশালী করেন, কারও গুনাহ মাফ করেন।

যিনি জীবন দান করেন, মৃত্যুও দান করেন, যাকে চান হেদায়াত দেন, যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। কারও প্রতি দয়ার বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আবার কাউকে পূর্ণ বঞ্চিতও করেন। কাউকে সম্মান দান করেন, কাউকে লাঞ্ছিত করেন। কারও জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার সামান তৈরি করেন, আবার কারও থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে যান। আপনি যখন সেজদা করেন, তখন এ বিষয়গুলো মনে রাখা আবশ্যকীয়, তাহলে অন্তর আলোকিত হবে।

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

(অধিক) সেজদার কারণে তাদের কপালে চিহ্ন পড়ে যায়।[২৬]

এটা আল্লাহ পাকের দয়া ও নুরের চিহ্ন। যার মধ্যে বিনয়, নম্রতা, আরাম, প্রশান্তির প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান রয়েছে। যা আর অন্য কোনোভাবে হাসেল করা যায় না। সেজদা নামাজের বিশেষ একটি রোকন, সেজদা অত্যন্ত দামি বস্তু।

■ জানা নাই যে তা কত পেরেশানি ও বিপদাপদ দূর করে।

---

২৬. সুরা ফাতাহ : ২৯।

■ কতই না জটিল ও কঠিন বিপদাপদ তার দ্বারা সমাধান হয়েছে। কত হাজার প্রয়োজন সেজদার দ্বারা পূরণ করেছে। কত অশ্রুসিক্ত দুআ সেজদার মাধ্যমে কবুল করেছেন।

নিজের সত্তাকে ফরশ (বিছানা) এর নিকটবর্তী করো, তাহলে আরশওয়ালার নিকটবর্তী হয়ে যাবে। আপন দেহ, অন্তর এবং আত্মার সাথে সেজদা করো, তাহলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নেয়ামত উপলব্ধি হবে, এ দুনিয়ার প্রকৃত শান্তি হাসেল হবে।

একটি পূর্ণাঙ্গ সেজদা

আমরা নামাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন সেজদা আদায় করছি। আপনার কি এমন আকাঙ্ক্ষা হয় না যে, আহ আমি যদি স্বয়ং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ চোখে দেখতাম যে, তিনি কীভাবে সেজদা করেন? এ অংশের আসল উদ্দেশ্য এটাই যে আপনাকে সেজদার সহিহ ব্যাখ্যা বলা হবে যেভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আদায় করেছেন। এ আশায় যে আমরাও তা সঠিকভাবে আদায় করতে পারি। আপনি যখন সেজদা করার ইচ্ছা করেন, তো নিচের দিকে ঝুঁকে আল্লাহু আকবার বলেন। একটু আগেও না পরেও না; বরং ঝোঁকার সময় বলবেন। সঠিক অভিমত এটিই যে, হাতের তালু হাঁটুর পূর্বে জমিন স্পর্শ করবে যেন উটের সাদৃশ্য না হয়। কপাল, নাক জমিনে স্পর্শ করার পূর্বে দৃষ্টি জমিনে পড়বে। এটা লক্ষ রাখবে যে, কপাল ও জমিনের মাঝে (কাপড় ইত্যাদি দ্বারা) যেন কোনো অন্তরায় না হয়, যার কারণে কপাল জমিনে না লাগে। হাতের তালু শক্তভাবে জমিনে লেগে থাকবে। আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখবে। আঙুলসমূহ, হাঁটু বৃদ্ধাঙ্গুলী কেবলামুখী থাকবে, হাতের তালু মাথার বা কাঁধের বরাবর থাকবে।

কনুই জমিন থেকে উঠিয়ে রাখবে। (পুরুষ) তার কনুই উভয় পার্শ্বের দেহ থেকে অধিক সরিয়ে রাখবে। শরীরের সাত হাড্ডির উপর সেজদা করবে। কপাল নাকসহ, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু, উভয় পা আঙুলের উপর ভর করে পূর্ণ অংশ জমিনের উপর অত্যন্ত শক্তির সাথে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরের সকল জোড়া আরামের সাথে আপন জায়গায় না আসে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত অবস্থায় কখনো কুরআন শরিফ

তেলাওয়াত করতেন না; বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দুআ পড়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী সেজদার অবস্থায় হয়। তাই তোমরা সিজদা অবস্থায় খুব বেশি দুআ করো। আমরা যখন সেজদায় থাকি তখন এ তাসবিহ পড়ব—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى.

পবিত্র আমার প্রভু যিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ।

(তিন বার বা তার চেয়ে বেশি)। এই দুআও পড়া যায়—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ، رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي.

হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র। হে আমাদের রব, তোমার প্রশংসা করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।[২৭]

অথবা এ দুআ পড়বে—

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

ফেরেশতা ও রূহের প্রতিপালক অত্যন্ত পাক, অত্যন্ত পূতপবিত্র।[২৮]

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিভিন্ন দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। যার প্রত্যেকটিতে রয়েছে অর্থ ও মর্মের বিশাল ভাণ্ডার এবং প্রশান্তির অনেক উপকরণ। দুআ করা মানে নিজে নিজে আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলার সমান। আপনি যদি কাউকে মহব্বত করেন, তবে তার সাথে বেশি বেশি কথা বলার চেষ্টা করেন। অধিক সময় পর্যন্ত তার সাথি হিসেবে থাকতে চান। আপনার কি স্মরণ আছে আল্লাহ তাআলা যখন ওয়াদিয়ে তুয়ায় মুসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথা বলেছিলেন? আল্লাহ যখন কথা বলছিলেন তখন মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে যাচ্ছিলেন। আর আল্লাহ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.

---

২৭. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/১৫৫।

২৮. মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বা : ১/২২৫।

হে মুসা, তোমার ডান হাতে কি?

তখন আনন্দের উম্মাদনায় তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন,

هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي.

এটা আমার লাঠি, আমি এতে টেক লাগাই, এর দ্বারা ভেড়ার জন্য পাতা ঝেড়ে দিই।[২৯]

তিনি উক্ত বিশেষ সাক্ষাতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতার জগতে পৌঁছে গেছেন। যখন তাঁর এ অনুভূতি হয়েছে যে, আমি কোন সত্তার সামনে দাঁড়িয়েছি, তখন নিজের আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে বলেন 'আর এর দ্বারা আমার আরও অনেক কাজ আছে।

ভবিষ্যতে যখন আপনি রবের এতটা কাছাকাছি হবেন, অর্থাৎ সেজদা করবেন, তখন ওই আরাম ও শান্তি অনুভব করার চেষ্টা করবেন, যেমন মুসা আলাইহিস সালাম করেছিলেন। এর জন্য নিজের মহব্বতকে স্মরণ করতে হবে। তাঁর সঙ্গে কথা বলুন, তাঁর 'হামদ' (প্রশংসা) করুন। তাঁর কাছে আবেদন করুন যে, তিনি যেন আপন দয়ায় ক্ষমা করে দেন। আর ওই প্রশান্তি হাসেল করুন যা শুধু তাঁর দরবারেই মিলে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

হে আল্লাহ! তোমার গোস্বা হতে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় কামনা করছি। তোমার সাজা হতে তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার কাছে তোমারই আশ্রয় চাই, আমি পরিপূর্ণভাবে তোমার প্রশংসা করতে পারি না, তুমি ওই রূপ যেরূপ প্রশংসা তুমি তোমার করেছ।[৩০]

নামাজের প্রতি রাকাতে রুকু ১টি, কিন্তু সেজদা ২টি, কেন? কারণ সেজদা নামাজের গুরুত্বপূর্ণ রোকন, তা দুইবার আদায় করতে হয়, একবার যথেষ্ট নয়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা দীর্ঘ করতেন যেন এ গুরুত্বপূর্ণ রোকন আদায় এর মাধ্যমে রবের সাথে অধিক সময় ব্যয় করা যায়।

---

২৯. সুরা ত্বহা : ৪৭।

৩০. মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বা : ২/৯৯, হাদিস নং ৬৯৪৩।

(অনেক সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন নাতিদের জন্য উপুড় হয়ে যেতেন ওই পর্যন্ত মাথা উঠাতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পিঠে উঠার কাজ শেষ না করতেন।)

একটি বিনীত নিবেদন

এ পর্যন্ত আমরা যেরূপ দেখলাম নামাজের প্রত্যেক অবস্থা একটি ভিন্ন অর্থ ও গুরুত্ব রাখে, তাই আমাদের প্রতিটি নড়াচড়ার একটা বাস্তবরূপ প্রতিফলিত হয়। আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া আমাদেরকে মনোযোগী করে রাখে। আমাদের আদায়কৃত প্রত্যেক শব্দে আমাদেরকে চিন্তা-ফিকির করার সুযোগ করে দেয়। এ নড়াচড়াগুলো আমাদের অন্তরকে নামাজে লাগিয়ে রাখে, আল্লাহ পাকের সাথে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক এবং অনুভূতি জাগিয়ে রাখে। যাতে মহব্বত, ভয়, আশা এবং বিনয় অন্তর্ভুক্ত।

আমরা এখন যে অবস্থানে পৌঁছেছি, তাতে আমাদের মধ্যে উচ্চস্তরের বিনয় এবং খোদাভীতি সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। এটা ওই অবস্থা, যা আমাদের সামনে আসা বিচার দিনের অবস্থার সদৃশ।

وَتَرٰى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায় প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।[৩১]

আমাদের এ দুনিয়ার হিসেবে এটা ওই অবস্থার মতো, যখন কেউ মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ পায়, তখন তার যে অবস্থা হয়। সে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। যখন দুই সেজদার মাঝে হাঁটু গেড়ে বসা হয় তখন নিজেকে ওই অবস্থানেই মনে করতে হবে।

এখন উক্ত অবস্থায় আমাদের কী বলা উচিত? এরচেয়ে উপযোগী শব্দ কি আমরা বলতে পারবো যে,

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي.

হে প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন, হে প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।

---

৩১. সুরা জাসিয়াহ : ২৮।

দুইবার, চারবার অথবা তার চেয়ে বেশি। কতবার আমরা আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করেছি এবং সীমালঙ্ঘন করেছি।

এ সময় অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় এত দীর্ঘ সময় বসতেন, যত দীর্ঘ সময় সেজদা করতেন এবং মাওলা পাকের কাছে দুআ করতেন।

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِيْ، وَارْفَعْنِي.

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, দয়া করো, আমাকে হেদায়েত দান করো, আমার ত্রুটিকে পূরণ করে দাও, আমাকে সুস্থতা দান করো এবং আমাকে রিজিক ও উচ্চ মর্যাদা দান করো।

আমরা আল্লাহর কাছে যা কিছু চাই তা এ দুনিয়ার জন্য চাই। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরকালের জীবন। কেয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ হিসাব-কিতাবের অপেক্ষায় থাকবে, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে থাকবেন, কেঁদে কেঁদে কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করতে থাকবেন। তিনি উম্মতের জন্য ওই পর্যন্ত কাঁদতে থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ জবাব না দিবেন যে, আপনি মাথা উঠান, হে মুহাম্মদ! আপনি চান দান করা হবে, সুপারিশ করুন গ্রহণ করা হবে। ওই সময় নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা হতে উঠে বসবেন এবং আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। এ দ্বারা বোঝা যায়, আমাদের দুআ দু'ভাবে শোনা হবে। সেজদাতে এবং তারপরও। অতঃপর যখন আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই তখন দ্বিতীয়বার সেজদায় লুটে পড়ি যেন তাঁর খুব কাছাকাছি হতে পারি। এবং এক সেজদা যথেষ্ট নয়। যেমনিভাবে কুরআন শরিফের প্রথম সুরা 'আলাক' শুরু হয়েছে اِقْرَأْ। 'পড়' দ্বারা, শেষ হয়েছে وَاسْجُدْ (সেজদা করো) দ্বারা, এমনিভাবে আমাদের নামাজের প্রত্যেক রাকাত শুরু হয় কেরাত দ্বারা এবং শেষ হয় সেজদা দ্বারা। ইবাদতের প্রত্যেক তরিকায় এক ভিন্ন সৌন্দর্য ও ভিন্ন মজা। আমরা যত বেশি জানবো তত বেশি তার সৌন্দর্য ও মজা অনুভব করবো। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

বলুন যারা জানে আর যারা জানে না উভয়ে কি এ সমান হতে পারে?[৩২]

---

৩২. সুরা যুমার : ৯।

বিদায়ী দৃশ্য

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

সকল জবানি, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবি! আপনার ওপর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।[৩৩]

আপনি যখন প্রথম রাকাত পূর্ণ করেন, তখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ান। যেন পুনরায় মনোযোগ দিতে পারেন এবং আপনার অন্তরকে বিনয় ও দাসত্বের জযবা দ্বারা পূর্ণ করতে পারেন। এটা যদি আপনার শেষ রাকাত হয় তবে আমরা বিদায়ের ক্ষণে পৌঁছে গেছি। 'তাশাহহুদ' হলো বান্দা এবং গাফুরুর রাহিম মালিকের সাক্ষাতের মাধ্যমে পরম সুন্দর সমাপ্তি।

আমাদের হাত হাঁটু বা তার কিছু উপরিভাগে থাকা চাই, আমরা যে সকল আদবের প্রতি লক্ষ রেখে তাঁর সাথে কথা বলি ওই পদ্ধতিতেই বিদায়ী অবস্থানের শুরু আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মহত্বের মাধ্যমে হয়। তাঁর চিরঞ্জীব সত্তা, তাঁর রাজত্ব এবং তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করার জন্য সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করে বলুন, وَالصَّلَوَاتُ সকল প্রশংসা ও বড়ত্ব এক আল্লাহর জন্য, সকল দুআ ও ইবাদত আল্লাহর জন্য, وَالطَّيِّبَاتُ আমাদের সকল উত্তম কাজ শব্দ ও আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য, কেননা আল্লাহ শুধু ভালো, ইখলাস ও নেক নিয়তের আমলই কবুল করেন।

সম্মুখের শব্দাবলী যা আপনারা উচ্চারণ করে থাকেন তা এমন শব্দাবলী, যা এক সুদীর্ঘ সফরে হাজারো মাইল অতিক্রম করে এক পবিত্র স্থানে পৌঁছে বলা হয়ে থাকে। যে স্থানকে 'মদিনা মুনাওয়ারা' বলা হয়। সেখানে এ জগতের সবচেয়ে বরকতপূর্ণ সত্তা আরাম করছেন অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবি

---

৩৩. মুআত্তা মালেক : ১৪৮।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ হে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলার শান্তি রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, প্রতিদিন আপনি এ প্রিয় সত্তাকে সালাম করছেন এবং তিনি জবাবও দিচ্ছেন। একটু এ হাদিসটি শুনুন। তোমাদের যে কেউ যখনই দুরূদ পাঠায়, তখন আল্লাহ আমার মধ্যে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন যেন তার জবাব দিতে পারি।

নিজের কাছের দরজার প্রতি একটু লক্ষ করুন এবং কল্পনা করুন যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দরজা দিয়ে মাত্র ভেতরে প্রবেশ করেছেন, তাঁর উজ্জ্বল গোলাপের ন্যায় পূর্ণ লাল চেহারা নিয়ে। অতি সুন্দরভাবে পাগড়ি বেঁধে, ধবধবে সাদা সুগন্ধযুক্ত পোশাক পরিধান করে। মনোমুগ্ধকর হাস্যোজ্জ্বল মুখে যা দেখে আপনি খুবই আনন্দিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ কোনো এক ব্যক্তিকেই সালাম দেয়ার ইচ্ছা করেছেন। আর সে লোকটি আপনি নিজেই, তখন আপনার কেমন লাগবে? যখন আপনি উক্ত শব্দগুলোর মাধ্যমে সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথোপকথন করছেন, একটু ভাবুন!

আপনার কাছে এ সুবর্ণ সুযোগ দৈনিক পাঁচবার আসে। আমরা কত লোক এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, আহা! আমরা যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে থাকতাম এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পারতাম? অথচ, উপরোক্ত শব্দাবলী আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেয়। সুতরাং এটা কি আমাদের জন্য আবশ্যকীয় নয় যে, অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক মহব্বতের সাথে তার প্রতি দুরূদ পাঠ করি? যেহেতু তিনি অসহনীয় কষ্ট ও মসিবত সহ্য করে আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামের এক বরকতময় আদর্শ পেশ করেছেন। যখন আপনি নিরক্ষর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্বীয় মহব্বত ও সম্মান উৎসর্গ করছেন, তাহলে একটু এ কথাও ভাবুন যে, আপনি কার সামনে বসা আছেন। ওই সত্তার সামনে যিনি আপনাকে এবং আপনার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি এত দয়ালু ও দাতা যে, তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে একবার দুরূদ পাঠ করে, তার প্রতি তিনি দশবার রহমত ও বরকত নাজিল করেন।

আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করে আপনি আপনার প্রতি ও আল্লাহ

তাআলার নেক বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করছেন। السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ প্রত্যেক নেক বান্দাদের প্রতি চাই তারা এ দুনিয়াতে থাকুক বা আসমানে থাকুক, মানুষ হোক বা ফেরেশতা হোক। অতঃপর উক্ত সম্মানিত শব্দসমূহ পুনরায় উচ্চারণ করছি যা তাওহিদ-এর উৎস, যদ্বারা আপনার মাঝে ইমানের নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল।

যখনই মৃত্যু আসে তো মানুষ দুই নামাজের মাঝেই মৃত্যুবরণ করে, ফজর ও জোহরের মাঝে বা আসরের মাঝে বা আসর ও মাগরিবের মাঝে বা মাগরিব ও ইশার নামাজের মাঝে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার শেষ কালিমা لا إِلَهَ إِلا اللهُ হবে সে জান্নাতে যাবে। এটা কোনো চমকপ্রদ কথা নয়; বরং এ কালেমা জান্নাতের চাবি। পরিশেষে এখন যখন এ বরকতময় সাক্ষাত নিজের সমাপ্তিকালে হচ্ছে, তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এর ওয়াদা রয়েছে যে, উক্ত মুহূর্তে দুআ কবুল করবেন। সবার আগে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করো, তারপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলের প্রতি দুরূদ পাঠ করো নিজের জন্য ও মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর উক্ত রাহমান ও রাহিম-এর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করো।

ওই দুআসমূহ শিখার চেষ্টা করো, যেগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন এবং যেগুলো আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রয়োজনকে শামিল করে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সালাত (রহমত) প্রেরণ করুন যেমনিভাবে আপনি ইবরাহিম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সালাত প্রেরণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসা ও বড়ত্বের অধিকারী। হে আল্লাহ! বরকত নাজিল করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি যেমনিভাবে আপনি বরকত নাজিল করেছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসা ও বড়ত্বের অধিকারী।[৩৪]

এ শেষ মঞ্জিলের পর যখন আপনি বাকি মুক্তাদির সাথে ডান দিকে সালাম ফেরাবেন, তো আপনার অন্তরে আরাম ও প্রশান্তির এক ঢেউ খেলতে থাকবে। যদি এরূপ নাও হয়, তবে তা আপনার কর্মফল যা আপনার অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দিয়েছে এবং আপনাকে আল্লাহ থেকে দূরে রেখেছে। উক্ত ত্রুটির জন্য কমপক্ষে তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান যাতে কিছু হলেও ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়। উক্ত আরাম ও প্রশান্তি তার রূহের সাথে হাসিল করা যায়, যা শুধু আল্লাহর নিকটই আছে। স্মরণ রাখবেন, আপনার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পাবে সে পরিমাণ আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে।

আপনার অন্তর বিনয় ও নম্রতায় ভরে যাবে। আপনার মন স্থির হয়ে যাবে। পরিশেষে নামাজে আপনার কাঙ্ক্ষিত মজা এসে যাবে।

সাক্ষাতের অবগতি, নামাজের দিকে ডাকো

আলোচনা এখনো পূর্ণ হয়নি, আসুন আজান সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। আপনার কি জানা আছে নামাজের শুরু কখন থেকে হয়? আপনি বলবেন, আল্লাহু আকবার থেকে? বরং তা তো আরও অনেক পূর্ব থেকে শুরু হয়ে যায়। নামাজের শুরু তো আজান থেকে হয়ে যায়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ওই সময় নামাজেই আছ যখন থেকে নামাজের অপেক্ষায় রয়েছ। আজান আপনাকে আপনার রবের সাথে মোলাকাতের প্রস্তুতির সংবাদ দেয়। সুতরাং ওই সময় থেকে আপনার মাঝে আনন্দ সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক যে, আমি আপন প্রভুর সাক্ষাতে যাচ্ছি। তাই যেন আপনি নামাজের অবস্থায়ই হয়ে যাচ্ছেন, কেননা আপনার মন

---

৩৪. আবু দাউদ তায়ালিসি : ২/৩৮৭, হাদিস : ১১৫৭।

নামাজেই লেগে আছে। আজান শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়, কারণ যখনই সে আজান শুনে রাগ ও আক্ষেপে দূরে ভাগতে থাকে। এ কথা জানার পর ধোঁকা দেয়ার জন্য এখন শয়তান নেই তাই আপনার মধ্যে এ পরিমাণ বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হওয়া চাই যা নামাজের জন্য আবশ্যকীয়। আজান আপনার নামাজের সওয়াব বৃদ্ধির কারণ। কেননা, যেসব কুমন্ত্রণা হতে আপনি নামাজেও বেঁচে থাকতে পারেন না, আজান আপনার মস্তিষ্ককে সেসব থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে।

আমরা আমাদের সওয়াব কীভাবে বাড়াব? নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুয়াজ্জিনের আজান শুনে যারা নামাজ আদায় করে, মুয়াজ্জিন তাদের সমপরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হন। উদাহরণস্বরূপ, মুয়াজ্জিনের আজান শুনে যদি ১০০ লোক নামাজ পড়ে, তাহলে তাঁর ১০০ লোকের নামাজের সওয়াব অর্জন হবে। আমরাও যদি মুয়াজ্জিনের উক্ত সওয়াবে শরিক হতে চাই, তবে আমাদের শুধু এতটুকু করতে হবে যে, আজানের জবাব দিতে হবে। অর্থাৎ ঠিক সেভাবেই বলতে হবে যেমন মুয়াজ্জিন বলে থাকেন। এটা আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি। একটু ভাবুন! যেন আপনি মক্কা শরিফে আজানের জবাব দিচ্ছেন, যেখানে লক্ষ-লক্ষ মানুষ নামাজ আদায় করছেন এবং যেখানে এক রাকাত নামাজ ১০,০০০ দশ হাজার রাকাত নামাজের সমপরিমাণ সওয়াব।

উক্ত বিষয়ে আল্লাহ তাআলার দয়া ও মহানুভবতার প্রতি চিন্তা করুন যে, একটি সহজ ও সাধারণ আমল কত বড় প্রতিদানের কারণ হচ্ছে। কোন শব্দে আজান শুরু হয়? اَللّٰهُ اَكْبَر। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ পাকের জাতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আপনার জীবনে আর কিছু নেই। আপনার কাজকর্ম, চাকরি, বিবি-বাচ্চা, নিদ্রা এসবের চেয়ে আল্লাহ বড়। এটা তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময়। তাই মুয়াজ্জিন উক্ত শব্দগুলো বার বার বলেন, আমরা সবকিছু ছেড়ে কেন দাঁড়াচ্ছি? জবাব সামনে রয়েছে। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। হে আল্লাহ! কেবল আপনার জন্যই সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি। তার বিপরীত আজানের প্রতি লক্ষ না করে এ চিন্তা করা যে, এখন আমার সামনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তাআলার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এগুলো উক্ত সত্তার চেয়েও অধিক পূজনীয়। لَا إِلٰهَ

إِلَّا اللهُ এরপরে আর কী আছে? আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই তখন কার তরিকা অনুসরণ করি? এটা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা। এভাবে নামাজ পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো। তাই মুয়াজ্জিন ডাকেন, أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدَ رَّسُوْلُ اللهِ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে (১) ইখলাস যা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর দাবি (২) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা أَنْ مُحَمَّدَ رَّسُوْلُ اللهِ এ দাবি। উক্ত বুনিয়াদি বিষয় সুরা কাহফের শেষ আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ (তবে) আমার নিকট ওহি আসে যে, তোমাদের মাবুদ তিনি একজনই, সুতরাং যে আপন পরওয়ারদিগার-এর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন নেক আমল করে এবং আপন রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।[৩৫]

দেখুন! আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকাম কত উঁচু। কারও নাম এত উচ্চতা লাভ করেনি যা তাঁর নাম লাভ করেছে। দুনিয়ার যে কোণেই মুসলমান বসবাস করুক না কেন প্রভাতের প্রথম আলো প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বে সে আজান দেয়া হয়। তাই আসুন এ যাবৎকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাসবিহে অংশগ্রহণ করি মুয়াজ্জিনের আজানের জবাব দিই। যখন আমরা আবদিয়াত ও অনুসরণের ঘোষণা দিয়েছি, তখন আমাদের কী করণীয়? حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ চলো নামাজের প্রতি। তবে এখানের উক্ত শব্দগুলো পুনরায় বলার স্থলে আমাদের কী বলা উচিত? আমাদের বলা উচিত لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ কেবল আল্লাহ তাআলাই আমাকে ইবাদতের জন্য উঠাতে পারেন এবং তিনিই তাওফিক দিতে পারেন। আমি তাঁর সাহায্য ছাড়া তা

---

৩৫. সুরা কাহাফ : ১১০।

পূরণ করতে পারবো না। তো আজান তার অর্থ ও মর্মের দিক থেকে ফাতিহার ন্যায়, যেখানে আমরা সর্বাগ্রেই এ ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, ইবাদত একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য, إِيَّاكَ نَعْبُدُ অতঃপর সে জন্য তাঁর সাহায্য কামনা করি। وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ; আর আমরা কেবল আপনার নিকটই সাহায্য কামনা করি।

আগত শব্দ আমাদের জন্য আরও বেশি প্রশান্তিমূলক। আগত শব্দসমূহে আমাদের জন্য সর্বপ্রকার সফলতার প্রতিশ্রুতি বহন করে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ সফলতার প্রতি অগ্রসর হও। এ নামাজ যদি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সব ধরনের জিম্মাদার হয় তবে কেন আমরা তার জন্য উঠব না? সে জন্যও আমাদের আসার শক্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেই হয়ে থাকে। তাই উক্ত শব্দগুলো আবারও বলব لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পরিশেষে যে শব্দাবলির মাধ্যমে আজান খতম হয় তা ওই শব্দাবলিই, যার শেষের শুরু হয়েছে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ দ্বারা।

আজান اللهُ اكبر দ্বারা শুরু হয়ে আপনাকে দুনিয়া ছাড়ার হুকুম দিচ্ছে, কেননা, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ একটি ডাক, একটি আহ্বান, যে আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করো। কেননা, এটা এমন এক জীবন, যার জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে হয়।

ভবিষ্যতে যখন আজান শুনবেন তো এভাবে শুনবেন যে, এটা আপনার ও আপনার মাহবুবের সাক্ষাতের ডাক। এভাবে ভাবুন যে, এক সন্তান তার মায়ের সাক্ষাতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সে এ ঘোষণা শুনছে যে, তার ফ্লাইট এসে গেছে। আজানেরও একটা বিশেষ মজা রয়েছে।

যে কেউ আপন রবের সাক্ষাতে আগ্রহী হয় আল্লাহও তার সাক্ষাতের আগ্রহী হয়। আপন রবের সাক্ষাতের এ আগ্রহ আপনাকে কালক্ষেপণ ছাড়াই বের হতে বাধ্য করে। একেবারে এভাবে যেভাবে মুসা আলাইহিস সালাম দৌড়ে ছিল তাঁর রবের সাক্ষাতের জন্য।

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى.

হে প্রতিপালক! আমি তাড়াতাড়ি তোমার দিকে আসলাম, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।[৩৬]

এটা একটা বাস্তব লজ্জার বিষয় যে, কিছু মানুষের জন্য আজান কেবল সুরের আওয়াজ হয়ে গেছে। ব্যস্ততার সময় যা ঠিকমতো শোনাও হয় না। তবে আমরা যখন জানতে পারলাম যে, আজানের উক্ত বিশেষ শব্দাবলিতে কী পরিমাণ শক্তি রয়েছে, তখন আমাদের সচেতনতা ফিরে আসলো। তাই আজান যেন আমাদের পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট হয়।

লক্ষণীয় বিষয়

ওজু সম্পর্কেও কিছু জেনে নিই। আমাদের অনেকের ওজু একটি অভ্যাসগত বিষয় হয়ে গেছে। মনে করা হয় যে, এটা এমন একটা আমল, যা নামাজ আদায়ের জন্য করতে হয়। অথচ ওজু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি জানেন কি ওজু কত বড় আমল। তা করার সময় আপনি কী বলেন? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কীভাবে করেছেন। আরও একটি বিষয় যে, পানি অপব্যয় না করা ইত্যাদি। তা ছাড়া এর আরও কত কিছু জানার আছে। আচ্ছা একটু ভাবুন! এর প্রত্যেকটি আমল আপনার দেহের অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত যেমন চেহারা, হাত, মাথা, এবং পা ইত্যাদি। কিন্তু... অন্তর কোথায়? অন্তর ওই স্থান, যাতে নিয়ত হয়। কত সাধারণ আমল মিজানে ভারি হয় নিয়তের কারণে, আবার কত বড় আমল এ নিয়তের কারণেই নষ্ট হয়ে যায়।

যখন কোনো আমলের সাথে নিয়তের (এখলাস) জড়িত হয়ে যায়, তখন তা এমনিতেই অনেক বড় হয়ে যায়। শুধু অঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত আমলের চেয়ে তার সওয়াব অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং ভবিষ্যতে যখন নামাজের জন্য ওজু করবে, তো মেশিনের মতো তাড়াহুড়া করবে না, বরং ধীরস্থিরতা ও ইখলাসের নিয়তে করবে। তাহলে বাস্তবিক পক্ষে ওজুর মাধ্যমে অনেক কিছু অর্জন হবে। ওজুর জন্য দাসত্বের অনুভূতি নিয়ে উঠবে এবং আল্লাহ পাকের আদেশ পালনের নিমিত্তে ওজু করবে।

---

৩৬. সুরা ত্বহা : ৮৪।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে তখন তোমরা স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো এবং মাথা মাসেহ করো এবং টাখনুসহ পা ধৌত করো।[৩৭]

প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে এবং এ নিয়তে ওজু করবে যে, আমি আমার বদ আমলসমূহ ধৌত করছি। যেহেতু আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের (নামাজের) জন্য শর্ত তাই পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর সাথে মোলাকাতের অনুমতি কারও নেই।

তাই ওজু আপনাকে বাহ্যিকভাবে পবিত্র করে, যেন তার দ্বারা আপনার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ আন্তরিক পবিত্রতা অর্জন হয়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোনো ব্যক্তি পূর্ণ শর্ত আদায়ের সাথে ওজু করে তো পানির সর্বশেষ ফোঁটা ঝরার সাথে তার গুনাহসমূহও ঝরে যায়। এমনকি নখ থেকে গুনাহ ঝরে যায়।

শরীরের সকল অংশ থেকেই গুনাহ ঝরে যায় যে গুনাহ হাত, পা মুখমণ্ডল (চোখ, কান, জিহ্বা) দ্বারা সংগঠিত হয়, গুনাহ ধুয়ে যাওয়া একটু নিজ (কল্পনার) চোখ দ্বারা দেখার চেষ্টা করবে। অন্তরে আল্লাহ পাকের রহমতের আশাবাদী হয়ে দেখার চেষ্টা করবে। ওজুর পর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে। أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ তারপর এ দুআ পড়বে,

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

হে আল্লাহ! আমাকে ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা সর্বদা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং আমাকে পবিত্রদের মাঝে শামিল করুন।

ওজু করার পর আপনি উভয় জগতের বাদশার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। সর্বদা এ ধরনের সাক্ষাতের পূর্বে সকলের জন্য নিজেকে বাদশার প্রভাব প্রতিপত্তি অনুযায়ী সুসজ্জিত করে এ ধরনের মজলিসে উপস্থিত করা চাই। ওজু আপনাকে এ ধরনের সাক্ষাতের উপযোগী বানিয়ে

---

৩৭. সুরা মায়েদা : ৬।

দেয়। এখন আপনি রবের দরবারে দাঁড়াতে পারবেন। ওজুর মাধ্যমে প্রাপ্ত এ সৌন্দর্য আমার সাথে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আহ আমি যদি আমার আগত ভাইদের চিনতে পারতাম অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত যারা পরে আসবে। অর্থাৎ ওই দিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ওজুর অঙ্গসমূহের উজ্জ্বলতার মাধ্যমে চিনবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজুর অঙ্গসমূহ নির্দিষ্ট সীমা থেকে একটু আগে বেড়ে ধোয়া পছন্দ করেছেন যেমন কনুই এবং টাখনু, যেন ওই দিন এ অংশগুলো অধিক আলো ও সম্মানের কারণ হয়। আমাদের এ অতিরিক্ত চেষ্টা শুধু আমাদের গুনাহকে মুছে ফেলে না; বরং তা আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধিরও কারণ হয়। ওজু আমাদের মর্যাদা এতো বৃদ্ধি করে যা আমাদের কল্পনাও হয় না। কীভাবে?

একদিন সকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল রাযি.-কে লক্ষ করে বললেন, তুমি জান্নাতে আমার আগে কীভাবে গেলে? (অর্থাৎ গোলাম হওয়া সত্ত্বেও আমলের দিক দিয়ে স্বীয় মালিক থেকে আগে বেড়ে যাওয়া)। আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি আর আমার আগে আগে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। উত্তরে বেলাল রাযি. বললেন, এরূপ বিশেষ আমল তো করি না, তবে প্রত্যেক আজানের (ওজুর) পর দুই রাকাত নামাজ পড়ি, আর যখন ওজু চলে যায় পুনরায় ওজু করে নিই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটাই কারণ'।

আমরা যখন ওজু হতে ফারেগ হই তো তাতে শাহাদাতের সীলমোহর লাগাই, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ যার ফলে জান্নাতের ৮টি গেইট খুলে যায় এবং যে গেইট দিয়ে চাই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

সারকথা

এক বর্ণনায় আছে যখন নামাজের সময় নিকটবর্তী হতো তখন তিনি কাঁপতে থাকতেন এবং তাঁর চেহারা পীতবর্ণের হয়ে যেত এবং বলতেন সে জিম্মাদারি আদায়ের সময় এসেছে যার বোঝা বহন করতে আসমান, জমিন এবং পাহাড় পর্যন্ত অস্বীকার করেছিল আর আমরা (মানবজাতি) তা গ্রহণ করেছি।[৩৮]

এখানে 'ওয়াদা' দ্বারা উদ্দেশ্য مرضى বা সন্তুষ্টি, ভালো-মন্দের জিম্মাদারি গ্রহণ করা। মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম যে জিম্মাদারি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তা হলো নামাজ। যদি উক্ত মুআমালা সঠিক হয়, তাহলে সামনের সব আমলের হিসাব সহজ হয়ে যাবে। আর যদি নামাজে সমস্যা হয়, তাহলে সামনের সব আমলেই সমস্যা হওয়া নিশ্চিত। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে নামাজ ছাড়ল সে কুফরি করল। নামাজ একটি ফরজ হুকুম শুধু এজন্য আদায় করবে না। তাহলে এটা তো নিয়তহীন ব্যক্তির কর্মের ন্যায় হবে। একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন, খাবার খাওয়া হয় বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে এটা ঠিক? তবে বর্তমানে মানুষ যেন খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকে। বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন ধরনের খাবার খেয়ে থাকে যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুব ভালো মনে হয়। বিভিন্ন স্বাদের খাবার খায়। আবার শেষে মিষ্টি বা আচার খায়, যেন প্রতি লোকমার স্বাদ আরও বাড়িয়ে দেয়। নামাজের সাথেও এ মুআমালা হওয়া উচিত। যেহেতু আপনি তাকে মহব্বত করেন এবং এর দ্বারা আপনার সীমাহীন প্রশান্তি লাভ হয়। আগে থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু করবেন। যেমনিভাবে মূল খানা শুরুর আগে ক্ষুধার চাহিদা সৃষ্টিকারী বস্তু গ্রহণ করেন। এমনিভাবে নামাজের প্রস্তুতি আজানের সাথেই করে দিবেন। ওজু থাকলেও আবার ওজু করে নিন, যেন অন্তরে নুর সৃষ্টি হয়। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন এখন আমার কী করা উচিত? আমি কার সাক্ষাতে যাচ্ছি। নিজের সতর ঢাকার জন্য পুরাতন (ময়লা) কাপড় নিবেন না; বরং মহান বাদশার দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পড়ার চেষ্টা করবেন। মোবাইল বন্ধ করে নিন। কারুকার্যহীন জায়নামাজ নিন। কেবলার দিক হয়ে দাঁড়ান। যদি জামাতে নামাজ পড়েন, তবে কাতার সোজা করে

---

৩৮. সুরা আহজাব : ৭২।

নিন। প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবেন, যেন ভালোভাবে মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

এটা হলো নামাজ। ইবাদত করার সবচেয়ে সুন্দর তরিকা। এটা এমন এক আমল, যা সীমাহীন প্রশান্তি আনয়ন করে, আত্মার পিপাসা নিবারণ করে। আপনার দেহ থাকবে জমিনে, কিন্তু আত্মা আল্লাহ পাকের আরশের নিচে ঘুরবে। নামাজ হলো আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে মহান তোহফা। যাতে ওই শান্তি ও আনন্দ রয়েছে যা আমরা সকলে তালাশ করি। এ জীবন পরীক্ষা, কষ্ট ও পেরেশানির বোঝায় নিপতিত। উক্ত বোঝা থেকে আমাদের মুক্তির প্রয়োজন, এসব বস্তু হতে আমাদের মুক্তি পেতে হবে, আর কে আমাদেরকে উক্ত বিষয় হতে মুক্তি দিতে পারে? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পারে না। আর উক্ত প্রশান্তি আমাদের নামাজে মিলবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

হে ইমানদারগণ! ইমান, ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[৩৯]

আপনার হয়ত জানা আছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে পেরেশান হতেন আর নামাজের সময় হতো তখন তিনি বলতেন, হে বেলাল! আমাকে (নামাজের মাধ্যমে) শান্তি দাও।

এ সুখ ও প্রশান্তি কেবল পূর্ববর্তীদের জন্যই নয় বরং আমরাও তা লাভ করতে পারি। আর যারা উক্ত রহস্য জানেন, যা আমাদের পূর্বপুরুষগণ করতেন যে, এ আরাম ও প্রশান্তি উন্নতমানের তাওজ্জুহ বা মনোনিবেশ দ্বারাই হাসেল হয় না; বরং তার জন্য রূহানি স্তরে পৌঁছতে হবে। অন্তরের মনোনিবেশ অত্যন্ত জরুরি। আপনি যদি এর দ্বারা ইতিবাচক ফলাফল হাসেল করতে চান, তাহলে আপনার অন্তর তার সাথে লাগিয়ে রাখতে হবে। আপনার শুধু ১০ মিনিট (নামাজ পড়াকালীন) আল্লাহ পাকের মহব্বতের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এখন দুনিয়া ভুলে যেতে হবে। দুনিয়ার কাজ-কর্মের জন্য ২৩ ঘণ্টার চেয়ে বেশি সময় রয়েছে। এ ১০ মিনিট আল্লাহ ও তাঁর সাক্ষাত লাভের প্রশান্তিতে নির্দিষ্ট করে নিন।

---

৩৯. সুরা বাকারা : ১৫৩।

নামাজে আদায়কৃত শব্দাবলী ও ক্রিয়াসমূহের প্রতি চিন্তা করুন এবং তা বোঝার চেষ্টা করুন। কারণ যখন আপনার এ খেয়াল থাকবে যে, আপনি কী করছেন এবং কী বলছেন তখন (নামাজে) আপনার মনোযোগ থাকবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এটাকে আমাদের জন্য নাজিল করেছেন, তাহলে আমরা তা হাসিলও করতে পারবো।

আপনার কি জানা আছে যে, নামাজের ওই অংশেরই সওয়াব পাওয়া যাবে যাতে মন-অন্তর উপস্থিত ছিল। যদি দু'ঘণ্টার ফিল্ম বা পরীক্ষায় পূর্ণ ধ্যান দেয়া যায়, তাহলে নামাজেও পারা যাবে। দুনিয়ার সবকিছু সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত, তাহলে আমরা অবশ্যই ১০ মিনিট থাকতে পারব। আল্লাহর কাছে এজন্য সাহায্য প্রার্থনা করুন, তাহলে আপনি এ পর্যায়ে পৌঁছে যাবেন। তখন মনে চাবে যে, এ নামাজ যেন শেষ না হয়।

যতটুকু আশা আপনার অন্তরে আসতে পারে সেই আশা নিয়ে নামাজ আদায় করুন। আল্লাহর ব্যাপারে যত বেশি অবগত হবেন, তত বেশি আশা আপনার অন্তর অনুভব করবে। আল্লাহ পাকের দয়ার আশা, তাঁর ক্ষমার আশা, তাঁর কবুলিয়তের আশা এবং মহব্বত ও নৈকট্যের আশা। উক্ত আশা 'খাহেশ' হতে নিশ্চিত আলাদা বস্তু। আশার সাথে আমল মিলিত থাকে যার জন্য আপনি আমল করেন। সুতরাং আল্লাহর কাছে তাঁর দয়ার আশা রাখ এবং আল্লাহর কাছে তা কামনা করো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

আমার কাছে দুআ করো আমি তোমাদের দুআ কবুল করবো, আর যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৪০]

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

৪০. সুরা গাফের : ৬০।

হে নবি! (আমার পক্ষ হতে লোকদেরকে) বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ তোমরা আমার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করেন, তিনিই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'[৪১]

আল্লাহ পাকের প্রভাব অনুভব করুন, যার অর্থ ভয়ের অনুভূতি। এমন ভয়, যার সাথে সম্মানও রয়েছে। ওই সীমাহীন আদব, যা তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালে অনুভব হয়। ভয়ের ছোট একটি উদাহরণ; যা স্বীয় পিতা বা বড় ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়ালে অনুভব হয়। আসুন ওই দুআসমূহ শিখি, যা আমাদেরকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহর ভয় কীভাবে অর্জিত হয়– আপনাকে ছাড়া কোনো মুক্তি নেই এবং আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এমন ফেরেশতাও রয়েছে যারা সৃষ্টির পর থেকে সেজদায় পড়ে আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে। তারা এ কথা বলতে থাকে, আপনার সত্তা মহান, আমরা আমার হক আদায় করে ইবাদত করতে পারি না। যখন আপনার আল্লাহ পাকের গুণাবলী যেমন- পরাক্রমশালী, শক্তিধর, প্রজ্ঞাময়, প্রতিশোধগ্রহণকারী ইত্যাদি এসবের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হবে এবং বিপরীতে নিজের অবস্থার অনুভূতি হবে, তাহলে নিজে নিজেই আপনার মধ্যে ভয় সৃষ্টি হবে। সবকিছুর উপর তাঁর বড়ত্ব এবং সবকিছুই তাঁর কবজায় আছে।

আমরা কেন তাঁর হুকুম লঙ্ঘন করি?

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا.

তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ পাকের বড়ত্বের বিশ্বাস রাখো না।[৪২]

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.

হে লোক সকল! তোমরা সকলে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি সকল প্রশংসার অধিকারী। তিনি যদি চান

---

৪১. সুরা যুমার : ৫৩।

৪২. সুরা নুহ : ১৩।

তোমাদেরকে ধ্বংস করে নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে দুনিয়া আবাদ করতে পারেন।[৪৩]

মেরাজের রাত্রিতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম-এর ওপর আল্লাহ পাকের সামনে যে ভয় প্রকাশ পেয়েছে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহর ভয়ে জিবরাইলকে উটের ছেড়া কাপড়ের মতো দেখা গিয়েছে। তাই নামাজের জন্য যখন দাঁড়াবে তো স্বীয় অন্তরে আল্লাহ পাকের মহব্বতের আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। এটা সে নেয়ামত ও রহমতের কৃতজ্ঞতা, যা তিনি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

নিজের মধ্যে লজ্জা ও শরমের জযবা সৃষ্টি করবে। কেননা আল্লাহ তাআলাই একমাত্র আমাদের বারবার অমান্যতা সত্ত্বেও সবরের সাথে সুযোগ দিচ্ছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

নিশ্চয়ই ইমানদারগণ সফলকাম, যারা নামাজে খুশু অবলম্বন করে।[৪৪]

উল্লিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে আপনি উক্ত খুশু লাভে সফলকাম হবেন, যার ফলে আপনার মাঝে সীমাহীন নম্রতা ও অক্ষমতা সৃষ্টি হবে। তাহলে আপনি নামাজের মাধ্যমে উক্ত উদ্দেশ্য লাভে সফল হবেন, যা আপনার প্রতিদানকে দ্বিগুণ করে দিবে। আপনি কি চিন্তা করেছেন, আপনি যখন নামাজে দাঁড়ান, তখন কী পরিমাণ কল্পনা ও চিন্তার স্রোত নেমে আসে, অথচ তা পূর্বে ছিল না। এটাই সে খুশু যা শয়তান আপনার থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। চোর এ চিন্তা করে না যে, এক বাদশার ঘরে চুরি করছে যার চতুর্দিকে পাহারা বসানো, না এক গরিবের ঘরে যেখানে কিছুই নাই। চোর ওই আমিরের ঘর তালাশ করে, যার মধ্যে হেফাজতের সামান কম। আপনার বিষয় এরূপই আপনার নিকট খুশুর দৌলত আছে, কিন্তু হেফাজত করতে পারছেন না। হ্যাঁ, যে খুশু উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেছে সে মহলের ন্যায়, যাতে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তো শয়তান এ চেষ্টাতে লেগে আছে যে, কীভাবে আপনার কাছ থেকে আপনার নামাজের সওয়াব ছিনিয়ে নিতে পারে।

---

৪৩. সুরা ফাতের : ১৫-১৬।

৪৪. সুরাতুল মুমিনুন : ১,২।

তবে আপনি যদি এভাবে নামাজ শুরু করেন, যা এ পর্যন্ত শিখানো হয়েছে, তাহলে আপনার নামাজ ত্রুটিমুক্ত হওয়া সম্ভব। আর নামাজ দ্বারা যে ফলাফল লাভ হয়, তা অর্জন করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ আন্তরিক প্রশান্তি ইত্যাদি। আর ধীরস্থিরে আপনার নামাজের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। একটু ভাবুন কোন মাসে সবচেয়ে বেশি খুশু লাভ হয়? সেটা রমজান মাস নয়? রমজানে বিশেষ করে কোন সময়? সেটা হলো তারাবিহ ও কিয়ামুল লাইল-এর সময়, এটা ঠিক না? উক্ত নামাজের কোন অংশে? সেটা হলো শেষে যে দুআ করা হয় সে অংশে। যখন সকল মানুষ হাত উঠিয়ে ইমামের সাথে আমিন বলেন। সে সময় যখন চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এবং ফুঁপিয়ে কাঁদার মাধ্যমে মসজিদে এক গুঞ্জন সৃষ্টি হয়। এ সময় আমাদের খুশুর অনুভূতি বেশি কেন হয়? নামাজের ওই অংশে কী রয়েছে, যেটা পৃথক একটা বিষয়? যেহেতু ওই সময় আপনি এটা অনুভব করেন যে, আপনি নিশ্চিতভাবে কারও সাথে কথা বলছেন। আপনি অনুভব করেন যে আপনি সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছেন। তাই উক্ত মূল্যবান সময়ে জীবনযাপনের জন্য পুরো এক বছর অপেক্ষা কেন করবো; বরং যখনই আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবো তখনই নিজের মধ্যে এ একীন সৃষ্টি করবো যে, আমি আল্লাহর সাথে কথা বলছি তাঁর দরবারে প্রার্থনা করছি। কিছু লোক মনে করে নামাজে আমি নিজেই কথা বলছি, এ বিষয়কে ভুলে যায় যে, আমি সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলছি। চলুন আমরা উক্ত ভুল ধারণা ভুলে গিয়ে সঠিক ভাবে আমল করি।

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের দুআসমূহ

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنَ الْمَاءِ البَارِدِ.

হে আল্লাহ! আপনার কাছে আপনারই মহব্বত কামনা করি, আর তাদের মহব্বত, যারা আপনাকে মহব্বত করে এবং ওই আমলের মহব্বত যা আপনার মহব্বত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, হে আল্লাহ! আপনার মহব্বত আমার নিকট আমার প্রাণ, আমার পরিবার-পরিজন এবং ঠান্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয়।[৪৫]

اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللّٰهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ.

হে আল্লাহ! আমাকে আপনার মহব্বত দান করুন এবং তাদের মহব্বত, যারা আপনার কাছে আমার জন্য উপকারী হয়। হে আল্লাহ! আমার পছন্দনীয় জিনিস, যা আপনি আমাকে দান করেছেন তাতে যা আপনি পছন্দ করেন আমাকে শক্তি দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যা চেয়েছি, তা হতে যেগুলো আমাকে বারণ করেছেন সেগুলো হতে আপনার পছন্দ অনুযায়ী আমাকে বিরত রাখুন।[৪৬]

---

৪৫. তিরমিযি : ৩৪৯০ হাসান গরিব, মুস্তাদরাকে হাকিম : ২/৪৭০।

৪৬. তিরমিযি : ৩৪৯১।

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقِرَّ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ.

হে আল্লাহ! আপনার মহব্বত আমার কাছে সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। সব ভয়ের চেয়ে আপনার ভয় আমার মধ্যে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী। আমার থেকে দুনিয়ার মহব্বত দূর করুন এবং আমাকে আপনার মহব্বতের আগ্রহী বানান এবং যখন আপনি দুনিয়া দ্বারা মানুষের চক্ষু শীতল করেন, তখন আপনার ইবাদতে আমাকে স্থিরতা বা প্রশান্তি দান করুন।[৪৭]

(উক্ত তিনটি দুআ ইবনে রজব হাম্বলি রহ. '*জামেউল উলুম ওয়াল হুকুম*' এ লিপিবদ্ধ করেছেন)।

৪৭. আবু নাঈম, হিলয়াতুল আওলিয়া : ৮/২৮২।

ইবাদত করার সবচেয়ে সুন্দর তরিকা নামাজ। এটা এমন এক আমল, যা সীমাহীন প্রশান্তি আনয়ন করে, আত্মার পিপাসা নিবারণ করে। আপনার দেহ থাকবে জমিনে, কিন্তু আত্মা আল্লাহ পাকের আরশের নিচে ঘুরবে। নামাজ হলো আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে মহান তোহফা। যাতে ওই শান্তি ও আনন্দ রয়েছে, যা আমরা সকলে তালাশ করি। এ জীবন পরীক্ষা, কষ্ট ও পেরেশানির বোঝায় নিপতিত। উক্ত বোঝা থেকে আমাদের মুক্তির প্রয়োজন, এসব বস্তু হতে আমাদের মুক্তি পেতে হবে, আর কে আমাদেরকে উক্ত বিষয় হতে মুক্তি দিতে পারে? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পারে না। আর উক্ত প্রশান্তি আমাদের নামাজে মিলবে। আপনার হয়ত জানা আছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে পেরেশান হতেন আর নামাজের সময় হতো তখন তিনি বলতেন, হে বেলাল! আমাকে (নামাজের মাধ্যমে) শান্তি দাও। এ সুখ ও প্রশান্তি কেবল পূর্ববর্তীদের জন্যই নয় বরং আমরাও তা লাভ করতে পারি। আর যারা উক্ত রহস্য জানেন, যা আমাদের পূর্বপুরুষগণ করতেন যে, এ আরাম ও প্রশান্তি উন্নতমানের তাওয়াজ্জুহ বা মনোনিবেশ দ্বারাই হাসেল হয় না; বরং তার জন্য রূহানি স্তরে পৌঁছতে হবে। অন্তরের মনোনিবেশ অত্যন্ত জরুরি। আপনি যদি এর দ্বারা ইতিবাচক ফলাফল হাসেল করতে চান, তাহলে আপনার অন্তর তার সাথে লাগিয়ে রাখতে হবে। আপনার শুধু ১০ মিনিট (নামাজ পড়াকালীন) আল্লাহ পাকের মহব্বতের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। দুনিয়ার কাজ-কর্মের জন্য ২৩ ঘণ্টার চেয়ে বেশি সময় রয়েছে। এ ১০ মিনিট আল্লাহ ও তাঁর সাক্ষাত লাভের প্রশান্তিতে নির্দিষ্ট করে নিন।

দারুল আরকাম
DARUL ARQAM
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-১০), গ্রাউন্ড ফ্লোর
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ০১৯৭৭ ৬৪৮১৮৫

নন্দন
ডিজাইন: আবুল ফাতাহ
01914783567